তালিবানে ইলমের রাহে মানযিল



রচনা

মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ.

জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ ও বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়ীতা

মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য : মাদরাসাতুল মদীনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

আমীনুত তালীম : মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

তালিবানে ইলমের রাহে মানযিল

রচনা
মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রহ.
মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১১-১৪১৭৬৪

প্রকাশকাল
জিলকদ ১৪৩১ হিজরী
অক্টোবর ২০১০ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-8950-02-9

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পেশ লফয

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، اَمَّا بَعْدُ!

এই পুস্তিকাটি তিনটি লেখার সমন্বয়ে তৈরি। ১. "দ্বীনী মাদরাসা সমূহের মজলূমানা হালত ও তালাবায়ে কেরামের দায়িত্ব" শীর্ষক সংক্ষিপ্ত লেখা যা মাসিক আল কাউসারে (জুমাদাল উলা ১৪৩০ হিজরী মোতাবেক মে ২০০৯ ঈসায়ী সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে আমার অনুরোধে মাওলানা আহমাদ মায়মুন ছাহেব প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করে দিয়েছেন এবং এ লেখাটি হযরত পাহাড়পুরী হুযুর দামাত বারাকাতুহুম-এর দু'আর সৌভাগ্যও অর্জন করেছে।

২. হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহ.)-এর ইখলাস ও আবেগপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক ভাষণ, যা তিনি অত্যন্ত দরদ নিয়ে তালাবায়ে কেরামের খেদমতে পেশ করেছিলেন; آپ کون ہیں کیا ہیں آپ کا منصب کیا ہے ؟ (অর্থাৎ, তোমরা কে? তোমরা কী? তোমাদের গন্তব্য কোথায়?) শিরোনামে যা একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে।

অনুবাদ সম্পর্কে একটি স্বীকৃত কথা হলো, অনুবাদে শব্দের ভাষান্তর সম্ভব হলেও মূলের আবেদনকে অক্ষুণ্ন রাখা দুরূহ। এজন্য আমি শ্রদ্ধেয় ও বরেণ্য বুযুর্গ হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ ছাহেবের খিদমতে বিনীত নিবেদন করেছিলাম তিনি যেন হযরত নোমানী ছাহেব (রহ.)-এর এ ভাষণের বঙ্গানুবাদ করে দেন। তিনি আমার নিবেদন কবুল করেছেন। নিজের অত্যন্ত জরুরী কাজ স্থগিত রেখে এর অনুবাদ করে দিয়েছেন। অনুবাদ চলাকালে তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি এর সম্প্রসারিত অনুবাদ করছেন। অনুবাদ হাতে পাওয়ার পর দেখি, এটা কেবল অনুবাদই নয়; বরং এক রকম ব্যাখ্যা-ভাষ্যই হয়ে গেছে। সমর্থন ও বিশ্লেষণধর্মী অতিরিক্ত সংযোজন ছাড়াও (কোন কোন জায়গায়) অনুবাদকের তরফ থেকে স্বতন্ত্র কিছু আলোচনাও যুক্ত হয়েছে, যা মূলের ভাব ও বক্তব্যকে আরো বেশী স্পষ্ট ও জোরালো করেছে।

আমার বিশ্বাস, অনূদিত ভাষণেও পাঠক আসল বয়ানের আছর, রূহানিয়্যাত, নূরানিয়্যাত, ইখলাস ও দরদ অনুভব করবেন। হযরতকে আল্লাহ্ উত্তম বিনিময় দিন এবং সুন্দর ও সুদীর্ঘ হায়াত দান করেন।

৩. মাদরাসাতুল মাদীনার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে লেখা হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ ছাহেবের একটি নসীহতপূর্ণ চিঠি যা তিনি বাইতুল্লাহ শরীফ হতে লিখে পাঠিয়েছিলেন। চিঠিটি মাসিক আল কাউসার সফর ১৪৩০ হিজরী সংখ্যায় আমার ভূমিকাসহ ছাপা হয়েছিলো। এখন সে চিঠিটিকে এ পুস্তিকার খাতেমা বানানো হচ্ছে।

আল্লাহ্ তাআলা এ সংকলনটিকে আমাদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন এবং এর প্রতিটি হেদায়েতের উপর আমাকে এবং সকল তালিবে ইলমকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমি আমার মুহতারাম ভাই জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান ছাহেবের আন্তরিক শোকরিয়া আদায় করছি। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল আশরাফ থেকে পুস্তিকাটি ছাপিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর এ প্রতিষ্ঠানকে কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ও দ্বীনী ইলমের খেদমতের জন্য একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠানরূপে কবুল করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

রবিবার বাদ আছর
২৫ শে শাবান ১৪৩১ হিজরী
৮ই আগস্ট ২০১০ ঈসায়ী

আরয গুজার
বান্দা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক
দারুত তাসনীফ মারকাযুদ দাওয়া আল-ইসলামিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! অনেক শ্রম ও সাধনার পর চার বুযুর্গের ফয়েয ও বারাকাত সিক্ত "তালিবানে ইলমের রাহে মানযিল" প্রকাশিত হচ্ছে। পুস্তিকাটি কলেবরে সংক্ষিপ্ত হলেও এর ফায়েদা ব্যাপক ও সুফল সুদূরপ্রসারী হবে ইনশাআল্লাহ। পুস্তিকাটি তালাবায়ে কেরামের একাকী পাঠের সাথে সাথে যদি সম্মিলিত পাঠের ব্যবস্থা হয় তাহলে এর উপকারিতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। এ পুস্তিকা বার বার পাঠ করে তাজদীদে আহ্দ (অঙ্গীকারের নবায়ন) করতে হবে। আমার তো ধারণা, এই একটি মাত্র পুস্তিকাই আমাদের শোধরানোর জন্য যথেষ্ট হবে যদি মুক্তমনে এটি পাঠ করা হয় এবং এর সবক নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করা হয়।

আল্লাহ্ পাক হযরত মাওলানা আবু তাহের মিস্‌বাহ্ ছাহেব ও হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুমকে উত্তম বিনিময় দিন। কারণ তারা উভয়ে তাদের জীবনকে ছাত্র গড়ার কাজে ওয়াকফ করে দিয়েছেন। সেই সাথে আমাদের তালিবে ইলম ভাইদেরকে তাদের দরদেদিল অনুধাবন করে তার কদর করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

আমরা এ পুস্তিকাটি ব্যাপকভাবে তালিবে ইলমের হাতে পৌঁছাতে চাই যাতে সকলেই নব জাগরণের এ কলজে ছেঁচা আকুতি শুনতে পায় এবং খুঁজে পায় যিন্দেগীর রাহে মানযিল। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে তাঁর সন্তুষ্টির পথে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

ইফতারের পূর্বক্ষণ
৫ রমযানুল মুবারক
১৪৩১ হিজরী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
১৩৬, আজিমপুর, ঢাকা-১২০৫

সূচিপত্র

হযরত মাওলানা আবদুল হাই পাহাড়পুরী হুযুর
দামাত বারাকাতুহুম-এর

দুআ ও অভিমত

আমি নিম্নোক্ত প্রবন্ধটি মনোযোগের সাথে শুনেছি। আমার মতে, এই নির্দেশনাগুলো পুরোপুরি সময় ও অবস্থার উপযোগী হয়েছে। এতে বর্তমান অবস্থার যে ত্রুটি ও সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তার সংশোধনের যে উপায় নির্দেশ করা হয়েছে তা কিতাব ও সুন্নাহর দলীল এবং শরীয়তের উসূল অনুযায়ী করা হয়েছে। আকাবির ও আসলাফ সব সময় এসব বিষয়ে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে এই নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন।

আশা করি, আহলে মাদারিস এই প্রবন্ধটি বেশি বেশি ইশাআত করবেন এবং তালিবে ইলমদেরকে এ অনুযায়ী আমল করার তারগীব দিবেন।

আল্লাহ তাআলা প্রবন্ধকার, প্রকাশক এবং সকল সহযোগিতাদানকারীর মেহনতকে কবুল করুন, তাদেরকে সঠিক পথে অবিচল রাখুন এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বপ্রকার কল্যাণ দান করুন। আমীন।

মুহতাজে দুআ
আবদুল হাই পাহাড়পুরী
৭ জুমাদাল উখরা ১৪৩০ হিজরী

দ্বীনী মাদরাসাসমূহের মজলূমানা হালত ও তালাবায়ে কেরামের দায়িত্ব

— মুহাম্মাদ আবদুল মালেক

কওমী মাদরাসাগুলো এখন যে নাযুক সময় অতিক্রম করছে তা কারো অজানা নয়। দীর্ঘদিন থেকেই দ্বীনী মাদরাসাগুলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বহুবিধ ষড়যন্ত্রের শিকার। দিন দিন পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটছে। এর বাহ্যিক কারণ হয়ত ওইসব জালিমের ইসলাম-বিদ্বেষ অথবা এসব দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের সঠিক পরিচয় সম্পর্কে তাদের চরম অজ্ঞতা। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, আল্লাহ তাআলা কেন তাদেরকে মাদরাসাগুলোর উপর চাপিয়ে দিয়েছেন? এর পিছনে কি কোনো অন্তর্নিহিত কারণও রয়েছে? আল্লাহ তাআলা কখন একটি জাতি বা সম্প্রদায়কে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি দ্বারা পুরস্কৃত করেন, আর কখন তাদের প্রতি আযাব ও গযব নাযিল করেন তার সুস্পষ্ট বর্ণনা কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে কুরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান দান করেছেন এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবগত আছেন, তারা অনুধাবন করেন যে, এসব দুরবস্থা কেবল বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা প্রবাহের ফলাফল নয় এবং শুধু বাহ্যিক কারণগুলোই একমাত্র কারণ নয়; বরং উদ্ভূত পরিস্থিতির পিছনে একটি অন্তর্নিহিত কারণও কার্যকর রয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো সম্প্রদায়কে কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ইযযত-সম্মান, প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা দান করেন তখন তারা সেসব বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শন করে এবং তাদের মধ্য থেকে ওইসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য লোপ পায় তখন তারা নিজেদের সম্মান মর্যাদা, প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা সবকিছুই হারিয়ে বসে। আর এই উদাসীনতা যত বেশি হয় লাঞ্ছনা-গঞ্জনার আযাবও তত কঠিন হয়ে থাকে।

খলীফায়ে রাশেদ হযরত উমর (রাযি.)-এর বাণী স্মরণ করুন। তিনি বলেন,

إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ أَعَزَّنَا اللّٰهُ بِالْإِسْلَامِ، فَمَهْمَا نَطْلُبِ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللّٰهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللّٰهُ

'আমরা ছিলাম অতি হেয় সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে মর্যাদা দান করেছেন। আমরা যদি আল্লাহর দেওয়া মর্যাদার পথ ছেড়ে অন্য পথে মর্যাদা অন্বেষণ করি তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছনায় পতিত করবেন'। এই ইলহামী উক্তির আলোকে চিন্তা করা উচিত, আহলে মাদারিসের প্রভাব ও মর্যাদার মূল বিষয় কী এবং এই মাদরাসাগুলোর প্রকৃত পরিচয় কী, বলাবাহুল্য, মাদরাসাগুলো ছিল 'রিজালুল্লাহ' তৈরির কেন্দ্র। রিজালুল্লাহ বলতে এমন ব্যক্তিদের বোঝায়, যারা তাফাক্কুহ ফিদ্দীন, রুসূখ ফিল ইলম (অর্থাৎ, দ্বীনের গভীর জ্ঞান, ইলমের পরিপক্কতা ও পাণ্ডিত্য) এবং তাকওয়া ও খোদাভীতির গুণে গুণান্বিত, যারা কর্ম ও আচরণ এবং সুরত ও সীরাত সকল বিষয়ে ইসলামী আদর্শের প্রতিনিধি আর অন্যের জন্য উসওয়ায়ে হাসানা, যাদের ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাত সকল সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে, যারা মুসলিম উম্মাহর ব্যথায় ব্যথিত এবং উম্মাহর কল্যাণে শরীয়তের বিধান মোতাবেক সর্বক্ষেত্রে নিবেদিত। তাঁদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা যুগের সমস্যা ও চাহিদাগুলো অনুধাবন করেন এবং তার সমাধান প্রদানের যোগ্যতা রাখেন। তাঁদের অবস্থা এমন নয় যে,

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ

'যে নিজের সমকালীন লোকদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা রাখে না সে অজ্ঞ।'

এখন আমাদের তালিবে ইলম ভাইদের চিন্তা করা উচিত তারা এই মানদণ্ডে কতটুকু উত্তীর্ণ? উত্তর তো নেতিবাচকই হওয়ার কথা। তাহলে আমাদেরকে এ থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে। সুতরাং কওমী মাদরাসাকে শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, সহযোগী, শুভানুধ্যায়ী সবাইকে মাদরাসার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সেই আদর্শের উপর অবিচল থাকতে হবে। আর এ বিষয়ে তালিবে ইলমদের দায়িত্বই সবচেয়ে বেশি। কেননা, তারাই মাদরাসাগুলোর মূলধন। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের এমন কিছু করণীয় রয়েছে, যেগুলোর প্রতি এখনই মনোযোগী হওয়া কর্তব্য।

১. নিজের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হওয়া। তালিবে ইলমকে নিজের পরিচয় জানতে হবে। হযরত মাওলানা মনযূর নোমানী (রহ.)-এর বয়ান

آپ کون ہیں کیا ہیں آپ کا منصب کیا ہے ؟

প্রত্যেক তালিবে ইলমের অবশ্যই অধ্যয়ন করা উচিত এবং সে অনুযায়ী আমল করা উচিত।

২. কওমী মাদরাসার প্রকৃত পরিচয় এবং তার আদর্শ-উদ্দেশ্য গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করা। এ বিষয়ে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)-এর বক্তৃতা সংকলন 'পা জা ছুরাগে যিন্দেগী' প্রথম সুযোগেই অধ্যয়ন করা উচিত।

৩. তাসহীহে নিয়ত এবং ইখলাস ও ইহতিসাবের বিষয়ে মনোযোগী হওয়া। মাঝে মাঝে নিজের নিয়ত যাচাই করে দেখা উচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত ইরশাদ সকলের স্মরণ রাখা চাই।

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لَا يَتَعَلَّمُهٗ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জনীয় ইলম শুধু এজন্য অর্জন করে যে, এর দ্বারা দুনিয়াবী কিছু বিষয় অর্জন করবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। (মুসনাদে আহমদ ২/৩৩৮ হাদীস ৮৫২; সুনানে আবু দাউদ ২/৫১৫ হাদীস ৩৬৬৪; সুনানে ইবনে মাজাহ পৃ. ২২ হাদীস ২৫২)

৪. এমন নিমগ্নতার সঙ্গে মেহনত করা, যার দ্বারা রিজালুল্লাহর কাতারে শামিল হওয়া যায়।

রসমী 'মাওলানা' হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া এবং এতেই নিজেকে আলেম মনে করতে থাকা দ্বীনী মাদরাসার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অথচ এটাই এখন আমাদের সবচেয়ে বড় ও দুঃখজনক বাস্তবতা।

৫. নিজের আচার-ব্যবহার, আখলাক-চরিত্র এবং আত্মা ও মনোজগতের পরিশুদ্ধির বিষয়ে যত্নবান হওয়া। ইলম অতি আত্মমর্যাদাশীল ও গায়রাতওয়ালা দৌলত, হৃদয় ও চরিত্রের পবিত্রতা ছাড়া সে কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে না। ইলমের কিছু বাক্য যে কেউ মুখস্থ করতে পারে, কিন্তু আলেম তো সে-ই, যার মধ্যে তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ও রুসূখ ফিল ইলম রয়েছে। আর এ দুই বৈশিষ্ট্য হৃদয় ও চরিত্রের পবিত্রতা ছাড়া কখনো অর্জন করা যায় না।

৬. প্রত্যেক তালিবে ইলমের অনুধাবন করা উচিত যে, শত্রুদের আক্রমণ থেকে একমাত্র আল্লাহই আমাদের রক্ষা করতে পারেন। এজন্য আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হল আমাদের প্রথম কর্তব্য। তাআল্লুক মাআল্লাহর জন্য যে বিষয়গুলো অপরিহার্য, সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে :

ক. এমন সব গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা, যেগুলো আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধকে বাড়িয়ে দেয়। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা এর অন্তর্ভুক্ত। এজন্য যত মুজাহাদা ও কষ্টই হোক না কেন অশ্লীল কাজ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা জরুরি।

খ. কুরআন ও হাদীসের আলোকে যে সকল কাজ লানতের কারণ বা আযাবের কারণ সেগুলো থেকে বিশেষভাবে বেঁচে থাকা। যে সকল গুনাহের কারণে পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আযাব নাযিল হয়েছে সেগুলো এই পর্যায়ভুক্ত। কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের সময় এদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। এজন্য মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুহী (রহ.)-এর 'আসবাবে লানত' নামক রিসালাখানা মুতালাআ করলে ফায়েদা হবে আশা করি।

গ. যে সমস্ত আমলের দ্বারা বিপদ দূর হয় এবং রহমত নাযিল হয় সেসব আমলে যথাসাধ্য ইহতিমাম করা। বিশেষত সামর্থ্য অনুযায়ী দান-সদকা করা, তা পরিমাণে যত কমই হোক না কেন, তাওবা ও ইস্তিগফার করা, প্রতিদিন কমপক্ষে একশবার কোনো না কোনো কালিমায়ে ইস্তিগফার পড়া উচিত। যদি এক বৈঠকে পড়া সম্ভব না হয় তবুও। তবে যেন অন্তর থেকে পড়া হয়। আমাদের ইস্তেগফার যেন এমন না হয় যেমন কোনো সালেকে তরীকত বলেছেন,

سبحہ بر کف توبہ برلب دل پر از ذوق گناہ

معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما

মুখে তাওবা উচ্চারিত হচ্ছে, হাতে তাসবীহ রয়েছে, আর অন্তরাত্মা গুনাহর কামনায় পূর্ণ হয়ে আছে। আমাদের এরূপ ইস্তেগফারের প্রতি স্বয়ং গুনাহেরও হাসি আসে।

সকাল-সন্ধ্যা মনোযোগ সহকারে দিল থেকে সায়্যিদুল ইস্তিগফার পড়া উচিত। বিশেষ করে শোয়ার পূর্বে তাওবা ও ইস্তিগফার করে নেওয়া চাই। এছাড়া দিনে-রাতে কমপক্ষে একবার সালাতুত তাওবা পড়া উচিত।

সায়্যিদুল ইস্তিগফারের পাঠ নিম্নরূপ :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ أَبُوْءُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُلَكَ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ.

ঘ. অহংকার, আত্মগরিমা ও হিংসার ন্যায় ধ্বংসাত্মক ব্যাধি থেকে নিজের অন্তরকে পবিত্র করার চেষ্টা করা। নিজের তালীমী মুরব্বী কিংবা ইসলাহী মুরব্বীর নিকট থেকে প্রতিকার জেনে সে মোতাবেক আমল জারি রাখা চাই।

ঙ. গীবত ও অন্যান্য মুখের গোনাহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা এবং অহেতুক কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে সময় নষ্ট না করা।

৮. নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত করা। প্রতিদিন কমপক্ষে ছয় তাসবীহ, ইশরাক, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন। অন্তত বিতরের পূর্বে দুই চার রাকাত নামায কিয়ামুল লাইলের নিয়তে পড়ার ইহতিমাম করুন।

৭. ইসলামের আদাবে যিন্দেগী মুতালাআ করে তার উপর আমল করার চেষ্টা করুন। এ বিষয়ে হাকীমুল উম্মত থানভী (রহ.)-এর আদাবুল মুআশারাত ও শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.)-এর "মিন আদাবিল ইসলাম" মুতালাআ করে আমলী জীবনে প্রয়োগ করুন।

৮. তালিবে ইলমের আসল কাজই হল, একাগ্রচিত্তে মুতালাআ করা, তাকরার করা ও তামরীন করা। অর্থাৎ ইসতিদাদ তৈরি করা, ইসতিদাদ পরিপক্ক করা, ইলমের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা এবং তাফাক্কুহ ও রুসূখ হাসিল করা। এসব বিষয়ে মগ্ন থাকলে আমাদের মত দুর্বলদের জন্য ওযীফা ও যিকির, নফল ও সুনানের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ হয় না। পক্ষান্তরে ইলমের মধ্যে নূর পয়দা করার জন্য এবং ইলমে কাস্‌বীর সঙ্গে ইলমে ওয়াহাবীর যোগসূত্র স্থাপনের জন্য এছাড়া আর কোনো পথও নেই। তাই তালেবে ইলম ভাইদের জন্য কয়েকটি হেদায়েত–

একটি হেদায়েত হল,

أَخْلِصْ دِيْنَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيْلُ

'অর্থাৎ, তোমার দ্বীনকে খাঁটি কর, তাতে ইখলাস পয়দা কর অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।' ইখলাসে দ্বীনের জন্য নিয়ত সহীহ করার পাশাপাশি ইহসান, ইহতিসাব এবং সকল কাজ সুন্নত তরীকায় করা জরুরী।

দ্বিতীয় হেদায়াত হচ্ছে,

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

'সকল হারাম থেকে বেঁচে থাক। তাহলে তুমি হবে সবচেয়ে বড় আবিদ।'

তৃতীয় হেদায়েত হচ্ছে

ঐ সমস্ত আমলের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া, যেগুলোতে সওয়াব ও ফায়দা অধিক কিন্তু আমল করা এতই সহজ যে, না তাতে বেশি কষ্ট করতে হয় আর না বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। এ ধরনের আমল সম্পর্কে জানার জন্য উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম-এর 'আসান নেকিয়াঁ' মুতালাআ করা যেতে পারে।

এ ধরনের সহজ আমলের মধ্যে মাসনূন দু'আগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তদ্রূপ অধিক হারে সালাম দেওয়া (ইফশাউস সালাম) যা শুধু সহজই নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নতও বটে, অথচ আজকাল এটি মাদরাসাগুলো থেকে বিদায় নিতে শুরু করেছে।

যে কাজই করি না কেন সুন্নত তরীকায় করব। এটি এমন এক আমল, যাতে সাধারণত অতিরিক্ত সময় ব্যয় হয় না। একটু খেয়াল করলেই হয়। এভাবে চিন্তা করলে আরো অনেক আমল পাওয়া যাবে।

৯. প্রত্যেক তালিবে ইলমের এ কথা বোঝা দরকার যে,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

আমি 'যিকির' (কুরআন) নাযিল করেছি আর আমিই তাকে হেফাযত করব।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা 'আযযিকর'-এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন। এজন্য আমরা যদি 'আযযিকর' ওয়ালা যিন্দেগী গ্রহণ করি, সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে সজ্জিত করি এবং সঠিক অর্থে যিকরের ধারক হই, তাহলে 'আযযিকর'-এর হেফাযতের সাথে সাথে আমাদেরও হেফাযত হয়ে যাবে।

মনে রাখবেন, ইলমের ধারক বলতে কেবল ইলমের পাঠককে বুঝানো হয় না। ইলমের ধারক সে-ই, যে ইলমের হুকুক ও আদাব পুরোপুরি আদায় করে।

১০. শত্রুদের কোপানল থেকে নিজেদের এবং দ্বীনী মাদারিস ও মারাকিযের হেফাযতের জন্য এ সংক্রান্ত মা'ছূর ও মুজাররাব দুআ ও আমলের বিশেষ ইহতিমাম করা আবশ্যক। যেমন–

١ - حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

٢ - لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنْتَ سُبْحٰنَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

٣ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنَ اللّٰهِ إِلَّآ إِلَيْهِ

٤ - إِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ

٥ - سُوْرَةُ يٰس

প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যদি ইজতিমায়ী দুআর ব্যবস্থা থাকে তাহলে তাতে ইহতিমামের সাথে শরীক হওয়া। নতুবা ব্যক্তিগতভাবে সুযোগ অনুযায়ী আমল ও দুআর চেষ্টা করা।

সবশেষে একটি কথা মনে রাখুন, আপনি যদি সত্যিকারের আলেম হন তাহলে আপনাকে দেখে শত্রুদের ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে, কিন্তু সেই ক্রোধ হবে তাদের জন্যই আযাবের কারণ। নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে।

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (سورة الفتح)

আর যদি আপনি শুধু ইলমের লেবাসধারী হন তাহলেও আপনাকে দেখে তাদের ক্রোধ পয়দা হবে (কেননা, এই নাম ও সুরতের প্রতিই তাদের বিদ্বেষ) কিন্তু তাদের সেই ক্রোধ তখন আপনার জন্য আযাবের কারণ হবে।

কেননা, আল্লাহ্ তাআলা শত্রুর অন্তর থেকে আপনার প্রভাব-প্রতিপত্তি বের করে দেবেন।

لَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ (ابو داود)

هٰذَا، وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمَ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِيْنَ

আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং সকল তালিবে ইলম ভাইকে সহীহ অর্থে তালিবে ইলম বানিয়ে দিন। এমন তালিবে ইলম বানিয়ে দিন যার অস্তিত্বই হবে দ্বীনী মাদরাসা ও মারকাযসমূহের হেফাযতের অসীলা। আমীন।

সৌজন্যে : মাসিক আল কাউসার
জুমাদাল উলা ১৪৩০ হিজরী

তালিবানে ইলমের উদ্দেশ্যে

তোমরা কে? তোমরা কী?
তোমাদের গন্তব্য কোথায়?

— মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহ.)

আমি আপনাদেরই একজন

আমার পেয়ারে ভাই! আপনারা হয়ত জানেন, আজ আমার এখানে আসার একমাত্র নিয়ত এই যে, এখানকার মাদারিসের তালিবানে ইলমের সামনে আমার মনের দীর্ঘ দিনের কিছু কথা এবং কিছু ব্যথা তুলে ধরবো। এখন আমার যা কিছু আবেদন ও নিবেদন তা আপনাদেরই খিদমতে, আপনাদেরই উদ্দেশ্যে। যদিও বলা হয়–

لَا تَنْظُرْ إِلٰى مَنْ قَالَ، وَانْظُرْ إِلٰى مَا قَالَ

'কে বলছে তা দেখো না, কী বলছে তা দেখো,

কিন্তু মানুষের স্বভাব এই যে, বক্তার পরিচয় দ্বারা শ্রোতাদের অন্তর প্রভাবিত হয়। বক্তার প্রতি আপনত্ব অনুভব করলে তার কথার একরকম আছর হয়, পক্ষান্তরে বক্তার প্রতি আজনাবিয়্যাত ও অপরিচয়ের কারণে অন্যরকম আছর হয়। তাই আমি শুরুতেই আমার পরিচয় পেশ করতে চাই, আমি কে?

তো আমার পেয়ারে ভাই! আমি আপনাদের পর বা আজনবি কেউ নই। মাদরাসার পরিবেশেই আমার জন্ম ও প্রতিপালন। আমি আপনাদেরই একজন। আমার এবং আপনাদের দিলের ধড়কন ও হৃদয়ের স্পন্দন অভিন্ন। আমার মস্তিষ্ক আপনাদের জন্য চিন্তা করে, আমার হৃদয় আপনাদের জন্য ব্যাকুল হয় এবং আমার চোখ আপনাদের জন্য কাঁদে।

একসময় আমি তালিবে ইলম ছিলাম, আলহামদু লিল্লাহ এখনো তালিবে ইলম আছি এবং ইনশাআল্লাহ যত দিন বেঁচে আছি, আপনাদের মত তালিবে ইলম হয়েই বেঁচে থাকবো এবং মৃত্যুবরণ করবো।

সুতরাং আমার কথাগুলোকে আপনারা গায়র ও আজনবীর শিকায়েত মনে না করে, আপনজনের কাছে আপনজনের কান্না ও দরদ-ব্যথা মনে করবেন বলে আমি আশা করি।

পেয়ারে বেরাদারান! যতই দিন যাচ্ছে, আমার দিলের জ্বালা-যন্ত্রণা ও ব্যথা-বেদনা ততই বেড়ে চলেছে। মাদারিস ও তার তালিবানে ইলমকে কেন্দ্র করে আমার দিলে বিভিন্ন আন্দেশা ও আশঙ্কা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে চলেছে। সামনে আমি যেন ঘোর অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি, যদি আমরা আত্মসংশোধনের চিন্তা-ফিকির না করি।

তাই কিছু দিন থেকে বড় অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে ভাবছিলাম, যেখানে যেখানে আছে দ্বীনী মাদারিস ও তালিবানে ইলম, আমি যাবো তাদের কাছে এবং তুলে ধরবো আমার মনের ব্যথার কাহিনী, আমার দিলের আফসানায়ে দরদ!

ভাই ও বন্ধু! সে উদ্দেশ্যেই আমি আজ এসেছি তোমাদের কাছে। আমার কিছু কথা শোনো, শুধু বাইরের কান দিয়ে নয়, দিলেরও কান দিয়ে।

এটা তো স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, ওলামায়ে উম্মত হলেন উম্মতের কলব বা হৃৎপিণ্ড। আর এই কলব ও হৃৎপিণ্ড সম্পর্কে আমাদের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

(শোনো! দেহের ভিতরে একটি পিণ্ড আছে, যখন তা সুস্থ থাকে, গোটা দেহ সুস্থ থাকে। আর যখন তা অসুস্থ হয়ে যায়, গোটা দেহ অসুস্থ হয়ে যায়। শোনো, সেই পিণ্ডটি হচ্ছে কলব।)

তো আমরা যাদের আলিম বলি, সমাজ যাদের আলিম বলে এবং দ্বীনী মাদারিসের ছায়ায় প্রতিপালিত হয়ে প্রকৃতপক্ষেই যারা আলিম-পরিচয় অর্জন করেছে এবং ইলমে দ্বীন হাছিল করেছে তারা যেহেতু এই উম্মতের কলব ও হৃৎপিণ্ড সুতরাং তারা যদি সুস্থ থাকে, গোটা উম্মত সুস্থ থাকবে, আর আল্লাহ না করুন, তারা যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে যদি ফাসাদ ছড়িয়ে পড়ে তাহলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা উম্মত আরো বেশী অসুস্থ হয়ে পড়বে; তাদের মধ্যে ফাসাদ ও বিপর্যয় আরো ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়বে।

আমার পেয়ারে ভাই! আপনাদের জীবন-যৌবন এবং সময় ও বয়সে আল্লাহ তাআলা ভরপুর বরকত দান করুন। ইনশাআল্লাহ আপনারাই হবেন এই উম্মতের আগামী দিনের আলিম। উম্মতের বাগানে আপনারা বর্তমানে কলি, ভবিষ্যতের ফুল। আপনাদের কাছে উম্মতের আশা ও প্রত্যাশা অনেক বিরাট। কারণ ঐ যে বললাম, উম্মত চায় আপনাদের মাধ্যমে রোগমুক্ত হতে এবং সুস্থতা

লাভ করতে। উম্মত চায় আপনাদের কল্যাণে সমস্ত দুর্গন্ধ থেকে বেঁচে থাকতে এবং দ্বীনের ও ইলমে দ্বীনের সুবাস লাভ করতে।

শুরুতেই আমি আমার পরিচয় দিয়েছি। আমি মাদরাসারই মানুষ। আপনাদেরই মত এক তালিবে ইলম। পার্থক্য এই যে, আমি বুড়ো, আপনারা যুবক। আপনাদের বয়স বিশ, আমার সত্তর। ইলমী সফরে আপনারা নতুন মুসাফির, আর এ পথে আমি পাড়ি দিয়েছি বহু দূর পথ। পথে পথে অর্জন করেছি অনেক অভিজ্ঞতা ও তাজরাবা, যা আজকের নও-মুসাফিরদের জন্য হতে পারে কীমতি যাদে রাহ এবং মূল্যবান পাথেয়।

আমার ভাই ও বন্ধু! আবারও বলছি, আমি এখন বের হয়েছি আমার দেশের দ্বীনী মাদারিসের 'হালপুরসি' করার জন্য। আমি বের হয়েছি নিজের তড়পে, নিজের দরদে; কেউ আমাকে ডাকেনি, আমার কাছে কারো আহ্বান আসেনি। আমি এসেছি আমার ভিতরের ডাকে, আমার আত্মার আহ্বানে। বলার কথা নয় তবু বলছি শুধু তোমাদের ভিতরের কানকে সজাগ করার জন্য। ভাই! বহু দূরদারাজের সফর করে, বহু কষ্টের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমি তোমাদের কাছে এসেছি। আমি এখন এক ক্লান্ত পথিক, এক 'থকা হুয়া' মুসাফির। সুতরাং আমি কি দাবী করতে পারি না! দাবী না হোক, অন্তত এইটুকু আবদার কি করতে পারি না যে, তোমরা দিলের কান দিয়ে আমার কথাগুলো শোনবে! আমার দরদ-ব্যথা একটু বোঝার চেষ্টা করবে! আবার বলছি, তোমাদের দিলের দুয়ারে আজ দস্তক দিয়েছে এক পেরেশান মুসাফির। একটু দুয়ার খোলো! একটু কথা শোনো!

কে আমরা? কোথায় আমাদের মানযিল?

আমার প্রথম কথা, আপনারা আপনাদের আত্মপরিচয় সন্ধান করুন এবং নিজেদের চিনতে চেষ্টা করুন। কে আপনারা? কোথায় আপনাদের গন্তব্য? কী আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য? সমাজের বুকে এবং উম্মতের মাঝে কী আপনাদের মর্যাদা? জীবনের পথে চলার জন্য বড় জ্বলন্ত উপরের প্রতিটি প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে পেতে হবে এবং সেভাবেই জীবনকে পরিচালিত করতে হবে, যদি আপনি জীবনের সফলতা ও যিন্দেগীর কামিয়াবী চান। আপনার জীবন দু'দিনের নয়, অনন্তকালের! আপনার যিন্দেগী ফানা হওয়ার জন্য নয়, বাকি থাকার জন্য।

কিন্তু আমার ধারণা, এখানে এমন তালিবে ইলম কমই আছেন, যারা এই প্রশ্নগুলো সম্পর্কে কখনো ভেবেছেন, যেমন ভাবা দরকার; যারা নিজেদের পরিচয় জানেন, যেমন জানা দরকার; যাদের অন্তরে দায়িত্ব ও মর্যাদার অনুভূতি আছে, যেমন থাকা দরকার। অবস্থা তো এই যে, না আছে কোন চেতনা ও গায়রাত, না আছে সাহস ও মনোবল। সকাল আসে, সন্ধ্যা হয়, দিন আসে, রাত যায়। এভাবেই সময়ের স্রোতে ভেসে চলেছে যিন্দেগীর কিশতি।

আমার মনে আছে, একসময় এমনই ছিলো আমার নিজেরও অবস্থা। তাই আমি বুঝতে পারি আপনাদের বর্তমান অবস্থা। বড় দুঃখজনক অবস্থা অবশ্যই, তবে এটাই সত্য, এটাই তিক্ত বাস্তব।

আলহামদু লিল্লাহ! আপনারা সবাই সমঝদার। যদিও বয়সে আপনারা বিভিন্ন স্তরের এবং অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর, তবু আপনাদের সবার সাধারণ একটি বুঝ আছে। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, বিশ্বজগতে যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সবই মানুষের জন্য। মানুষ ছাড়া যা কিছু দেখা যায় এবং দেখা যায় না সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষেরই সেবা করার জন্য।

বুঝতে যদি কষ্ট হয় তাহলে আপনাদের খুব কাছে সহজ একটি উদাহরণ দেখুন। এই যে মসজিদে আমরা একত্র হয়েছি, এখানে কত কিছু আছে! মিম্বর আছে, জায়নামায আছে। গালিচা আছে, ঘড়ি ও পাখা আছে। অযু-পানির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। এগুলো কী জন্য এবং কার জন্য? নামাযী ও মুসল্লীদের জন্য। এটা বুঝতে তো আপনাদের কারোই সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, এগুলো মুসল্লীদের জন্য, মুসল্লীরা এগুলোর জন্য নয়। এখানে যা সত্য, সৃষ্টিজগতের ক্ষেত্রেও তা সত্য। যা কিছু আছে আকাশে এবং পৃথিবীতে সব মানুষের জন্য। চাঁদ-সূর্য মানুষের জন্য, নদী-সাগর মানুষের জন্য, পাহাড় ও মরুভূমি মানুষের জন্য। গাছের ফল, মাঠের ফসল, বনের পশু, নদীর মাছ, এমনকি ভূগর্ভের সকল সম্পদ মানুষের জন্য, কিন্তু মানুষ এগুলোর কোনটির জন্য নয়। দেখুন এ মহাসত্য কুরআনে কত বার কতভাবে ঘোষিত হয়েছে–

خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

(যমীনে যা কিছু আছে তা তোমাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন।)

সুতরাং এটা সুসাব্যস্ত হয়ে গেলো যে, সৃষ্টিজগতে মানুষই হচ্ছে আসল ও মূখ্য। মানুষ ছাড়া যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের সেবা করার জন্য।

এখন অনেক বড় একটি প্রশ্ন; সবকিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তো মানুষকে কী জন্য এবং কার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? এমন তো কিছুতেই হতে পারে না যে, মানুষকে আল্লাহ তাআলা অযথা বানিয়েছেন! উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেছেন! সমগ্র সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্য হলো মানুষ, আর মানুষ হলো উদ্দেশ্যহীন!

تَعَالَى اللّٰهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا

(এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আল্লাহ ঊর্ধ্বে, বহু ঊর্ধ্বে।)

কারো বলে দিতে হয় না, একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিচক্ষণতা এবং ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা দান করা হয়েছে শুধু এজন্য যে, মানুষ যেন তার স্রষ্টাকে চিনতে পারে, স্রষ্টার আনুগত্য গ্রহণ করে এবং স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে। এভাবে যেন সে স্রষ্টার কাছ থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান ও পুরস্কার লাভের উপযুক্ত হতে পারে। যারা এটা করবে তাদের উপর আল্লাহ তাআলার অশেষ দয়া ও করুণা এবং অনুগ্রহ ও অনুকম্পার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। পক্ষান্তরে যারা স্রষ্টার প্রতি বিদ্রোহ করবে এবং অবাধ্যতা ও নাফরমানির জীবন বেছে নেবে তাদের উপর মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর ক্রোধ ও প্রতাপের এবং কাহর ও গযবের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে।

মানুষের প্রতি আল্লাহ তাআলার সবচে' বড় অনুগ্রহ এই যে, মানুষকে তিনি তার সৃষ্টি-উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত করার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা করেছেন। বিশ্বজগতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? মানুষের প্রতি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ কী? স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার কী এবং অবাধ্যতার শাস্তি কী? এ সকল বিষয় মানুষ যেন সুস্পষ্টরূপে জানতে ও বুঝতে পারে এবং মান্য করতে পারে সেজন্য আল্লাহ তাআলা কিতাব ও রাসূল এবং নবী ও পয়গম্বর প্রেরণের সিলসিলা কায়েম করেছেন। এই সিলসিলা শুরু হয়েছে মানবজাতির আদি পিতা হযরত আদম (আ.) থেকে এবং তা সমাপ্ত হয়েছে সর্বশেষ নবী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে।

নবী ও ওয়ারিছে নবী

এটা আমরা সবাই জানি যে, এই পৃথিবীতে আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের প্রতি আসমানী দায়িত্ব ছিলো দু'টি। প্রথমত অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আদেশ-নিষেধ ও হিদায়াত গ্রহণ করা, ধারণ করা এবং বহন করা। দ্বিতীয়ত অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আদেশ-নিষেধ ও হিদায়াত আল্লাহর বান্দাদের নিকট পৌছানো এবং সেই হিদায়াতের উপর তাদেরকে পরিচালিত করার চেষ্টা-মেহনত করা।

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে যখন সাইয়েদুনা হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিতাব ও রিসালাত দিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়, পৃথিবী ও মানব বসতি তখন পরিবর্তনের এমন কিছু পর্যায় অতিক্রম করেছিলো এবং মানবজাতি ও মানব সভ্যতা উন্নতি ও অগ্রগতির এমন একটি উচ্চস্তরে উপনীত

হয়েছিলো যে, একটি সার্বজনীন ও সর্বকালীন নবুয়ত ও শরীআত ঘোষণা করাই ছিলো হাকীম ও মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাআলার হিকমত ও প্রজ্ঞার দাবি। সুতরাং হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিতাব ও নবুয়তকে আখেরী কিতাব ও আখেরী নবুয়তরূপে ঘোষণা করা হয়েছে, কারণ তাতে সার্বজনীনতা ও সর্বকালীনতার পূর্ণ যোগ্যতা বিদ্যমান ছিলো। সেই সঙ্গে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে এমন আসমানী নেযাম ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে এই নবুয়ত ও শরীআত সর্বকালের জন্য অবিকৃত অবস্থায় সুসংরক্ষিত থাকে, যাতে নতুন কোন নবুয়ত ও হিদায়াতের প্রয়োজনই দেখা না দেয়। তাই আমার, আপনার এবং প্রতিটি মুসলিমের ঈমান ও আকীদা এটাই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন হিদায়াত এসে গেছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত সুসংরক্ষিত থাকবে। সুতরাং নতুন অহী ও নবী এবং নতুন কিতাব ও শরীআতের না কোন প্রয়োজন আছে, না কোন অবকাশ আছে। তো অহীর মাধ্যমে হিদায়াত গ্রহণ ও ধারণ করার প্রথম কাজটি হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সুসম্পন্ন ও সুসমাপ্ত হয়ে গেছে। তবে দ্বিতীয় কাজটি এখনো অব্যাহত রয়েছে। আর তা হলো অহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে অবতীর্ণ হিদায়াত সকল মানুষের নিকট পৌঁছানো এবং তাদেরকে সেই হিদায়াতের উপর পরিচালিত করার চেষ্টা-মেহনত চালানো। এই কাজের গুরুদায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর অর্পণ করা হয়েছে।

তো উম্মতে মুহাম্মাদী কারা? আমি, আপনি, আমরা সকলেই উম্মতে মুহাম্মাদীর অংশ। হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যারা আখেরী নবী বলে বিশ্বাস করে তারাই উম্মতে মুহাম্মাদী। পৃথিবীতে উম্মতে মুহাম্মাদীর দু'টি অবস্থান। প্রথম অবস্থানে উম্মতে মুহাম্মাদী ও অন্যান্য নবীর উম্মত সমান। অর্থাৎ নবীর আনীত হিদায়াত ও শরীআতের অনুসরণ করা এবং তার উপর আমল করা। প্রত্যেক নবীর উম্মতের উপর এটা অপরিহার্য ফরয ছিলো, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরো তা ফরয– শরীআতের অনুগত থাকা এবং শরীআতের উপর আমল করা। দ্বিতীয় অবস্থানটি হচ্ছে এই উম্মতের একক বৈশিষ্ট্য। তা এই যে, উম্মতের প্রত্যেক সদস্যের অপরিহার্য কর্তব্য হলো সম্ভাব্য সকল উপায়ে শরীআতে মুহাম্মাদীর হেফাযত ও সংরক্ষণ এবং তার প্রচার-প্রসারের চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত-মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করা। তাদের দায়িত্ব হলো, সারা পৃথিবীতে সমগ্র মানবজাতির নিকট হিদায়াত ও শরীআত পৌঁছে দেয়া এবং তার উপর তাদেরকে পরিচালিত করার জন্য নবীওয়ালা

মেহনতে আত্মনিয়োগ করা। আর এ সূত্রেই উম্মতে মুহাম্মাদী হচ্ছে নবুয়তের দাওয়াতী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নবীগণের নায়েব বা ওয়ারিছ।[১]

বিরাছাত ও নিয়াবাতের এ মহা দায়িত্ব পুরো উম্মতের উপর ন্যস্ত হয়েছে, তবে এক্ষেত্রে স্তর– তারতম্য অবশ্যই রয়েছে। একটি হলো সাধারণ স্তর, যার জন্য বিশেষ কোন বুদ্ধি-প্রজ্ঞা এবং বিশেষ কোন জ্ঞান-যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। ঈমানের দাবিতে উম্মতের প্রত্যেক সদস্যই এর অন্তর্ভুক্ত। বিরাছাত ও নিয়াবাতের এই সাধারণ স্তরের দায়িত্বও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তবে এই দায়িত্ব ও যিম্মাদারীর ক্ষেত্রে রয়েছে একটি বিশেষ স্তর, আর তা এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইলমে ওয়াহী এবং যে হিদায়াত ও শরীআত রেখে গিয়েছেন তা সংরক্ষণ করা এবং তার প্রচার-প্রসারের মেহনত-মুজাহাদায় আত্মনিয়োগ করা। নবীর নিয়াবাত ও বিরাছাতের এটি অতি উচ্চ স্তর, যা উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত। মূলত এরাই হলেন নবীগণের প্রকৃত ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী এবং নাইব বা প্রতিনিধি।

আমাদের দ্বীনী মাদরাসাগুলো প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল যোগ্য মানুষ গড়ার কারখানা, যারা কুরআন ও সুন্নাহর গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য জীবনব্যাপী সাধনায় নিয়োজিত হবেন এবং নিয়াবাত ও বিরাছাতের সুমহান দায়িত্ব ও যিম্মাদারী পালনের জন্য যিন্দেগী ওয়াকফ করে দেবেন।

আমারে পেয়ারে ভাই! এটাই হচ্ছে দ্বীনী দায়িত্বের দিক থেকে আপনাদের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা এবং এটাই আমাদের দ্বীনী মাদারিসের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কুরআন মজীদে উম্মে ঈসা হযরত মারয়াম বিনতে ইমরান-এর জন্মপ্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। ইমরানের স্ত্রী যখন সন্তানসম্ভবা হলেন (এবং সম্ভবত লক্ষণযোগে পুত্রসন্তানের আশা লাভ করলেন) তখন তিনি মান্নত করলেন যে, আমি আমার গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দিলাম। পবিত্র কুরআনে এই মহান মান্নতের বর্ণনা এভাবে এসেছে–

رَبِّ إِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

---

১. এ বিষয়ে সঠিক কথা এই যে, দ্বীনের হেফাযত ও প্রচারের কাজ পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরয ছিলো। পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও নায়েবে নবী ও ওয়ারিছে নবী বিদ্যমান ছিলো। এ বিষয়টি কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

এখানে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহ.)-এর বক্তব্য থেকে আমাদের জন্য যে বিষয়টি শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় সেটা সামনে আসছে... আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন। আবদুল মালেক।

হে (আমার) প্রতিপালক, নিশ্চয় আমি 'উৎসর্গ' করে দিলাম আপনার জন্য আমার গর্ভে যা আছে তাকে, (ইহজাগতিক যাবতীয় দায় ও দায়িত্ব থেকে) মুক্ত করে। সুতরাং কবুল করুন আপনি আমার পক্ষ হতে। নিঃসন্দেহে আপনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।)

বনী ইসরাঈলের শরীআতে এই রীতি ছিলো যে, আল্লাহর নেক বান্দা ও বান্দীরা তাদের নবজাতককে আল্লাহর নামে ওয়াকফ করে দিতেন। ঐ সন্তানকে বলা হতো 'মুহাররার', অর্থাৎ (দুনিয়ার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থেকে) আল্লাহর জন্য মুক্তকৃত সন্তান। তাদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য হতো এই যে, আমাদের সন্তানকে আমরা আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি। জীবনের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব থেকে, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে, উপার্জন ও জীবিকা থেকে সে মুক্ত থাকবে। বিবাহ ও সংসার নির্বাহ-এর ঝামেলায় কখনো নিজেকে সে জড়াবে না। বৈরাগ্যব্রত গ্রহণের মাধ্যমে সারা জীবন সে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন এবং উপাসনালয়ের সেবায় নিযুক্ত থাকবে। তো উম্মে ইমরান তার গর্ভস্থ সন্তানকে পুত্রসন্তান ধারণা করে আল্লাহর জন্য ওয়াফক করে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ তা কবুল করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে যখন কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলো তখন তিনি পেরেশান হয়ে বললেন–

رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا أُنْثَى

(হে আমার প্রতিপালক, আমি তো কন্যাসন্তান প্রসব করেছি!)

আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى

(আল্লাহ অধিক অবগত ঐ বিষয়ে যা সে প্রসব করেছে। আর নয় পুরুষমাত্রই নারীর সমতুল্য)

যাই হোক উম্মে মারয়াম বা ইমরাআতে ইমরান তার মান্নত পালন করে শিশু মারয়ামকে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিলেন, আর তিনি হযরত যাকারিয়্যা (আ.)-এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হলেন। এই ওয়াকফকৃত সন্তান কত বরকতপূর্ণ ছিলেন তা তো আপনারা কুরআনের আয়াত থেকেই জেনেছেন।

সন্তান ওয়াকফে শরীআতে মুহাম্মাদীর বিধান

ইমাম আবু বকর জাছ্-ছাছ রাযী (রহ.) তাঁর 'আহকামুল কুরআন' কিতাবে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেন–

'সন্তানকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করার এ ধারা শরীআতে মুহাম্মাদীতেও বহাল রয়েছে, তবে শরীআতে মুহাম্মাদীর স্বভাব ও প্রকৃতি অনুযায়ী তার রূপ

সংশোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সন্তানকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করতে চায় তারা এভাবে নিয়ত করবে যে, এই সন্তানকে আমি আল্লাহর জন্য এবং তার দ্বীনের খিদমতের জন্য ওয়াকফ করলাম। এতে সে ইলমে দ্বীন হাসিল করা এবং দ্বীনের খিদমত করার জন্য ওয়াকফ হয়ে যাবে। তখন সে শুধু আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে এবং তার সারা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইলমের তলব করে যাওয়া, দ্বীনের খিদমত করে যাওয়া এবং উম্মতকে সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর পরিচালিত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। তবে আমাদের শরীআতে মুহাম্মাদীতে এজন্য তার সংসার ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই এবং অনুমতিও নেই। জীবনকে সে আল্লাহর নামে উৎসর্গ করবে জীবনের অঙ্গনে অবস্থান করে এবং যিন্দেগিকে দ্বীনের জন্য কোরবান করবে যিন্দেগির ময়দানে 'সার্গারম' থেকে। প্রয়োজনে সে উপার্জন ও জীবিকার পথ গ্রহণ করবে, বিবাহ-সংসার নির্বাহ করবে এবং সন্তান-সন্ততির তারবিয়াত করবে, এমনকি মা-বাবার সেবা-দায়িত্বও পালন করবে, কিন্তু তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে ইলমের তলব, দ্বীনের খিদমত এবং আল্লাহ তাআলার রিযা ও সন্তুষ্টি অর্জন। জীবনের অঙ্গনে অবস্থান করেও এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথেই হবে তার জীবন ও মরণ। যিন্দেগির ময়দানে 'সার্গারম' থেকেও এটাই হবে তার মাকছাদে হায়াত ও মাতলাবে মওত।

ভাই ও বন্ধুগণ! আমরা, আপনারা, যারা দ্বীনী মাদরাসায় ইলমের তলবে এসেছি, আমাদের মা-বাবার তো আসলে কর্তব্য ছিলো আমাদেরকে এভাবে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দেয়া এবং কুরআনের ভাষায় 'মুহাররার' করে দেয়া। আমাদের তো হওয়া উচিত ছিলো এমন যে, সকল ঘাট ত্যাগ করে একমাত্র ইলমে দ্বীনের ঘাটে যিন্দেগির কিশতীকে বেঁধে রাখা।

কিন্তু আমার ধারণা, এখানে এমন ভাই খুব কমই আছেন যাদেরকে তাদের মা-বাবা ও মুরুব্বী এভাবে চিন্তা-ভাবনা করে, বুঝে শুনে, উম্মে মারয়ামের মত কোরবানির জাযবা নিয়ে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ এবং দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন, যাদের নিয়ত হলো, আমার সন্তানকে সবকিছু থেকে আমি মুক্ত করে দিলাম এবং দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের জন্য আযাদ করে দিলাম। তবে আমার পেয়ারে ভাই! তখন না হোক, এখন কিন্তু এ মহাসৌভাগ্য অর্জনের পথ আপনাদের জন্য খোলা রয়েছে। আপনি এখনই নিয়ত করতে পারেন এবং আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য, নবীর বিরাছাত ও নিয়াবাত-এর জন্য নিজেকে ওয়াকফ করে দিতে পারেন। আপনি এখনই এই নিয়ত করুন–

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ نَفْسِي مُحَرَّرَةً، فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

যেভাবে আপনি নামাযের নিয়ত করেন, আর আপনার নামায শুধু আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, আপনি রোযার নিয়ত করেন, আর আপনার রোযা শুধু আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, আর আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন যে, বান্দা আমার জন্য রোযা রেখেছে, সুতরাং আমি নিজ হাতে তাকে এর প্রতিদান দেবো। তো যেভাবে নিয়তের মাধ্যমে আপনার নামায-রোযা আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, ঠিক সেভাবে আপনি আপনার পুরা যিন্দেগির বিষয়ে নিয়ত করুন যে, আমি আমার পুরা যিন্দেগি আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য এবং আল্লাহর রাসূলের বিরাছাত ও নিয়াবাতের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম। তো ব্যস, আপনার নামায-রোযা ও হজ্জ-যাকাতের মত আপনারা পুরা যিন্দেগি আল্লাহর জন্য হয়ে গেলো। এখন থেকে আপনার সারা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই হবে আল্লাহর দ্বীনের খিদমত করা এবং খাদেম হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। আপনি ইলম হাসিল করবেন শুধু এই উদ্দেশ্যে যে এর মাধ্যমে আপনি নবীর বিরাছাত ও নিয়াবাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেবেন। আমাদের মিল্লাতের 'আব্বা' হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মত পূর্ণ ঈমান ও ইয়াকীনের সঙ্গে আপনি বলুন–

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ

নিঃসন্দেহে আমি আমার মুখমণ্ডল (ও সমগ্র সত্তাকে) অভিমুখী করেছি ঐ মহান সত্তার প্রতি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী, এমন অবস্থায় যে, আমি (তাঁর প্রতি) একনিষ্ঠ। আর নই আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

আরো বলুন–

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

(নিঃসন্দেহে আমার সালাত ও যাবতীয় ইবাদত এবং আমার জীবন ও মৃত্যু রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য।)

আপনি যখন এভাবে পূর্ণ অনুভব-অনুভূতি এবং চেতনা ও উপলব্ধির সঙ্গে নিয়ত করবেন এবং নিজেকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করে দেবেন তখন আপনার পুরা যিন্দেগী আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। আপনার জীবনের প্রতিটি কাজ, এমনকি আপনার আহার-বিহার, আরাম-বিশ্রাম এবং জীবিকা ও সংসার সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় হবে এবং ইবাদত বলে গণ্য হবে। তখন আপনি নতুন একটি পরিচয় লাভ করবেন। আপনার অবস্থান ও পরিচয় হবে এই যে, আপনি 'হিযবুল্লাহ্' বা আল্লাহর বিশেষ দলভুক্ত। এই নিয়ত ও ফায়সালার মাধ্যমে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সেই 'সৈন্যবাহিনী'তে ভর্তি হয়ে গেলেন যারা দ্বীনে মুহাম্মাদী ও উম্মতে মুহাম্মাদীর হেফাযতের যুদ্ধে নিয়োজিত।

এ মর্যাদার তুলনা নেই

আমার পেয়ারে ভাই! সত্যি সত্যি যদি আপনি আল্লাহর বিশেষ দলভুক্ত হওয়ার নিয়ত করে থাকেন, আপনি যদি দ্বীনে মুহাম্মাদী এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর হেফাযতে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হয়ে থাকেন এবং আপনি যদি নবীর বিরাছাত ও নিয়াবাতের সুমহান দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে একটু ভেবে দেখুন, দুনিয়ায় এর চেয়ে উচ্চ কোন অবস্থান ও মর্যাদা আর কী হতে পারে?! আল্লাহর দলে যারা তাদের চেয়ে বড় আর কে হতে পারে? ইসলামের সৈন্যদলের সিপাহী ও সিপাহসালার যারা তাদের চেয়ে শক্তিশালী আর কে হতে পারে? নবীর ওয়ারিছ ও নাইব যারা তাদের চেয়ে ইয্যতওয়ালা আর কে হতে পারে?! তারা অন্যদের দেখে ঈর্ষা করবে, না অন্যরা তাদের দেখে ঈর্ষা করবে?!

তো আমি আবার বলছি, দিলের পূর্ণ দরদ ও হামদর্দির সঙ্গে বলছি, আপনাদের মধ্য হতে কোন ভাই এখনো যদি বিষয়টির গুরুত্ব ও আযমত অনুধাবন না করে থাকেন, আপনি জাগ্রত হোন এবং পূর্ণ বুঝ ও সমঝের সঙ্গে নিয়ত করুন, ফায়সালা করুন এবং নিজেকে আল্লাহর জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দিন। আপনার নিয়তে যদি ইখলাস ও নিষ্ঠা থাকে, লিল্লাহিয়াত এবং আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ থাকে তাহলে নির্দ্বিধভাবে আপনি বিশ্বাস করুন– আল্লাহ তাআলা আপনাকে কবুল করে নিয়েছেন, আপনি আল্লাহর খাছ বান্দারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

আল্লাহর জন্য ওয়াকফ হয়ে যাওয়ার এই নিয়ত ও ফায়সালার পর ইনশাআল্লাহ আপনার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। আপনার চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণায় আমূল বিপ্লব সাধিত হবে। আপনার মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হবে। নিজেকে আপনার মনে হবে পরম সৌভাগ্যবান এবং এটাই সত্য। আসলেই আপনি পরম সৌভাগ্যবান। আপনার মর্যাদা এখন আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। সেই হীনমন্যতা আপনাকে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারে না, দুর্ভাগ্যজনকভাবে যা এখন আমাদের দ্বীনী মাদরাসাগুলোতে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্রদের বিরাট অংশ এবং শিক্ষকদেরও উল্লেখযোগ্য অংশ আজ হীনমন্যতার শিকার। এমনকি কিছু কিছু আলিমে দ্বীনও এখন ভাবতে শুরু করেছেন যে, ইলমে দ্বীন শিক্ষা করে তারা এখন বিরাট ক্ষতি ও খাসারায় পড়ে গেছেন। না আছে তাদের শিক্ষার স্বীকৃতি, না আছে চাকুরীর সুযোগ। দুনিয়ার আরাম-আয়েশ থেকে তারা বঞ্চিত, অভাব ও দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী, এককথায় আমাদের কোন ভবিষ্যত নেই।

এ ধরনের হীনমন্যতা একজন তালিবে ইলমের অন্তরে কেন আসে? কীভাবে আসে? আসে শুধু এজন্যই যে, নিজেদের পরিচয় তাদের জানা নেই। নিজেদের মাকাম ও মর্যাদা সম্পর্কে তারা অবগত নয়।

কিন্তু যদি বুঝতে পারি যে, আমরা এখন আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত, আমরা দ্বীনে মুহাম্মাদী ও উম্মতে মুহাম্মাদীর সেবায় নিবেদিত, আমরা নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করেছি এবং আল্লাহ আমাদের কবুল করেছেন, ইনশাআল্লাহ তাহলে 'যিল্লতি ও কমতরির ইহসাস' কখনো আমাদের 'শাখছিয়াতকে মাজরূহ' করতে পারে না, হীনতা ও হীনমন্যতার অনুভূতি কখনো আমাদের ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের ধারে কাছে আসতে পারে না। বরং নিজেদেরকে তখন মনে হবে দুনিয়ার শাহানশাহ! তখন অন্তরের অনুভূতি হবে এই যে, আল্লাহর পক্ষ হতে এমন মাকাম ও মর্যাদা আপনি লাভ করেছেন যা দুনিয়ার কোন বাদশা-শাহানশাহ লাভ করতে পারেনি! এমন মানযিল ও গন্তব্যে আপনি পৌঁছে গেছেন, যা দুনিয়ার বড় থেকে বড় কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। হৃদয় ও আত্মার জগতে আপনি তখন এমন শান্তি ও প্রশান্তি এবং স্বস্তি ও স্থিতি অনুভব করবেন যা আল্লাহর নেক বান্দাদের কিসমতেই শুধু নসীব হয়। তখন এ পথে অভাব ও দারিদ্র্য যদি এসেই পড়ে সেটা আপনার মনে হবে সৌভাগ্য, কারণ আপনি তো বিরাছাতের চূড়ান্ত হক আদায় করেছেন। আপনার নবী ক্ষুধার জন্য পেটে পাথর বেঁধেছেন, কী জন্য? শুধু দ্বীনের জন্য! সেই ক্ষুধার 'স্বাদ' আপনি সামান্য হলেও ভোগ করেছেন।

যদি সমাজের পক্ষ হতে যিল্লতি ও উপহাস আসে, সেটা আপনার মনে হবে খোশকিসমতি, কারণ আপনি তো নিয়াবাতের পূর্ণ হক আদায় করেছেন। আপনার নবীকে তো পাগল বলা হয়েছে, পাথর ছোঁড়া হয়েছে। কী জন্য? শুধু দ্বীনের জন্য! সেই যিল্লতি ও উপহাসের কিছু হিছ্ছা আপনারও ভাগে এসেছে।

কষ্ট-দুর্ভোগের এই জীবনকে, অভাব ও দারিদ্র্যের এই যাতনাকে আপনি তখন আল্লাহর জন্য কোরবানি এবং জিহাদ ও মোজাহাদারূপেই গ্রহণ করবেন। এটাকেই আপনার তখন মনে হবে কামিয়াবি ও সফলতার রাজতোরণ। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছো সে সওদার জন্য আনন্দিত হও। আর সেটাই তো বিরাট কামিয়াবি।)

এখানে এ বিষয়ে আপনাদের সতর্ক করা জরুরি মনে করছি যে, আমার এ বক্তব্য দ্বারা একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আপনাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা

জাগ্রত করা এবং হীনমন্যতার কবল থেকে উদ্ধার করা। আল্লাহ না করুন, আত্মগর্ব ও অহঙ্কার এবং বড়ত্ব ও কিবির পয়দা করা কখনই আমার উদ্দেশ্য নয়। গর্ব ও অহঙ্কার তো হলো বিতাড়িত ও অভিশপ্ত হওয়ার কারণ।

আসলে আমাদের মনে যেন গর্ব ও অহংকার না আসে এজন্যই আল্লাহ তাআলা এ পথে কিছুটা অভাব ও দারিদ্র্য এবং হীনতা ও যিল্লতি রেখে দিয়েছেন। তারপরো তো অনেকের মধ্যে অহঙ্কার ও বড়ত্বের অনুভূতি এসে পড়ে এবং যিন্দেগিতে হালাকাত ও বরবাদি নেমে আসে।

তো গর্ব ও অহঙ্কার যেন না আসে। আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য এই যে, দ্বীনের ইলম, দ্বীনের খিদমত এবং উম্মতের রাহনুমায়ির দায়িত্বকে দুনিয়ার সবচে' মর্যাদার বিষয় মনে করুন এবং এজন্য জীবন-যৌবন উৎসর্গ করে দিন এবং জান-মাল ওয়াকফ করে দিন, আর আল্লাহ যে দয়া করে তা কবুল করেছেন সে জন্য আল্লাহর শোকর আদায়করুন এবং পদে পদে যে ভুল-ত্রুটি ও কোতাহি হয় সে জন্য তাওবা-ইস্‌তিগফার করুন। গর্ব ও অহঙ্কারের অবসর কোথায় বলুন! আমাদের অন্তরে তো আশা ও প্রত্যাশা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে ভয় ও উৎকণ্ঠা।

আমরা অমূল্য, আমাদের মাকাম অত্যুচ্চ

তো আমার পেয়ারে ভাই! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার একই কথা বলছি, কারণ একই দরদ, একই ব্যথা বারবার দিলের ভিতরে চাড়া দিয়ে উঠছে। এখনো যদি আপনারা নিজেদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য না জেনে থাকেন, এখনো যদি নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা না বুঝে থাকেন তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে এখন জেনে নিন, এখন বুঝে নিন। এ মুহূর্তে, এই মসজিদে বসেই নিয়ত করে নিন এবং ফায়সালা করে ফেলুন যে, আমাদের জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিলাম, কিসের বিনিময়ে? জান্নাতের বিনিময়ে। খরিদ করার ঈজাব করেছেন স্বয়ং আল্লাহ, আপনি তা কবুল করছেন। ঈজাব ও কবুল দ্বারাই বেচা-কেনা হয়ে যায়। মুহূর্তের কাজ। আপনি এক বিরাট বাগান খরিদ করবেন। আপনি শুধু বললেন, বাগানটি আমি খরিদ করতে চাই একলাখ টাকার বিনিময়ে। বাগানের মালিক বললো, আমি রাজি। ব্যস হয়ে গেলো বেচা-কেনা। মুহূর্তের মধ্যে আপনি বাগানের মালিক হয়ে গেলেন, এমনকি এখনো মূল্য পরিশোধ না করেও। তো এখানে আল্লাহর ঘরে বসে এই মুহূর্তে আপনি আল্লাহর সঙ্গে বেচা-কেনা করে ফেলুন। আল্লাহ ঈজাব ও প্রস্তাব করেছেন, হে আমার বান্দা, আমি তোমার জান-মাল খরিদ করতে চাই জান্নাতের বিনিময়ে! বড় লোভনীয় প্রস্তাব, আপনি বলে ফেলুন, আমি রাজি! ব্যস, হয়ে গেলো। আপনার জান-মাল চলে গেলো আল্লাহ

তাআলার মালিকানায়, আর আপনি হয়ে গেলেন জান্নাতের মালিক! জান্নাতের সওদা! মুহূর্তের কাজ, এখনই, এই মুহূর্তে করে ফেলুন। তারপর দেখুন, আপনার চিন্তা-চেতনায় কী বিরাট পরিবর্তন আসে! আপনার হিম্মত ও মনোবল কত দূরে কোন্ উচ্চতায় পৌঁছে যায়! মনে হবে, এই মুহূর্তে আপনি নবজন্ম লাভ করেছেন, ফরস থেকে আপনি আরশে পৌঁছে গেছেন।

হীনতা বলুন, হীনমন্যতা বলুন, যা কিছু হচ্ছে শুধু এ কারণে যে, নিজেদের আপনারা চিনতে পারছেন না; নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা বুঝতে পারছেন না। ফলে শুধু নিজেদেরকে নয়, বরং সমগ্র 'ইলমী খান্দান'কেই বে-কীমত ও মূল্যহীন মনে হচ্ছে এবং মনে হচ্ছে দুনিয়ার বাজারে আপনারা অচল মুদ্রা। আর কোন সম্প্রদায় নিজের চোখে নিজে যখন ছোট, তুচ্ছ ও মূল্যহীন হয়ে যায় তখন অন্যদের চোখেও সে তুচ্ছ ও মূল্যহীন হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে যদি আমরা হযরত মারয়াম সিদ্দীকার আম্মা যা করেছিলেন তা করতে পারি, অর্থাৎ নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করতে পারি এবং মাখলুক থেকে আশা ও প্রত্যাশার সকল বন্ধন ছিন্ন করে শুধু আল্লাহর হয়ে যেতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের অনুভূতি এটাই হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাদের মূল্য আদায় করতে পারবে না; আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাদের খরিদ্দার হতে পারবে না। দুনিয়ার বাজারে যে কোন বস্তুর, যে কোন ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণ করা এবং পরিশোধ করা সম্ভব, সম্ভব নয় শুধু কোন তালিবে ইলমের মূল্য নির্ধারণ করা। কেননা তার মূল্য তো দুনিয়ার তুচ্ছ সোনা-চাঁদি ও মণি-কাঞ্চন দ্বারা হয় না; তার মূল্য নির্ধারণ করা যায় শুধু এবং শুধু জান্নাত দ্বারা। আমরা যদি নিজেদের মূল্য বুঝতে পারি তাহলে ঈমানের দৃঢ়তা এবং বিশ্বাসের দৃপ্ততা নিয়ে মানব-সভায় এ ঘোষণা দিতে পারি, হে মানুষ! দুনিয়ার বাজারে সবকিছুর সওদা হতে পারে, আমাদের সওদা হতে পারে না। কবির ভাষায়–

نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز

('নার্খ বালা কুন কেহ আরযানী হুনূয')

('আরে দাম বাড়াও, বাড়াতে থাকো; এখনো তুমি অনেক সস্তা ভেবেছো আমাকে।')

পেয়ারে ভাই! আমি অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে বলতে চাই, নিজের অস্তিত্বের প্রতি আমার যেমন বিশ্বাস, তার চেয়ে বড় বিশ্বাসের সঙ্গে আমি বলতে চাই, যখনই আপনারা বিশুদ্ধ অন্তরে এই নিয়ত করে নেবেন, যখনই আপনারা ঘোষণা করবেন যে, আমরা আল্লাহর জন্য (ওয়াকফ) হয়ে গেলাম এবং এই ঘোষণার উপর অবিচল থেকে এর শর্তগুলো পূর্ণ করতে থাকবেন তখন

ইনশাআল্লাহ দুনিয়াতেই আপনাদের উপর আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ নেমে আসবে। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে গায়ব থেকে এমনভাবে সাহায্য করবেন যে, তা অনুমান করা, কিংবা কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এককথায় আপনি যখন আল্লাহর জন্য হয়ে যাবেন তখন আল্লাহ আপনার জন্য হয়ে যাবেন।

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ

(যে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়, আল্লাহ তার জন্য হয়ে যান)

হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ বান্দার কান হয়ে যান, যা দ্বারা সে শোনে, বান্দার চোখ হয়ে যান যা দ্বারা সে দেখে, বান্দার হাত হয়ে যান, যা দ্বারা সে ধরে।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা

এ ক্ষেত্রে আপনাদের সামনে আমি নিজেকে দৃষ্টান্তরূপে তুলে ধরতে কোন সংকোচ বোধ করবো না। কারণ আমি মনে করি, এ যুগের মানুষের জন্য তাতে বড় শিক্ষা রয়েছে। আমার জন্মস্থান হচ্ছে ইউপির মুরাদাবাদ জেলার সম্ভল নামক মহকুমা। প্রশাসনিক কাঠামোর দিক থেকে এটি মহকুমা ও সাবডিভিশন হলেও জনবসতির দিক থেকে এর গুরুত্ব ছিলো অনেক বেশী। তখন এর জনসংখ্যা ছিলো লাখের উপরে। তো আজ থেকে ষাট সত্তর বছর আগে আমার আব্বাজান মহকুমার নেতৃস্থানীয় ও বিত্তবানদের একজন বলেই গণ্য হতেন। সুতরাং সন্তানদের জাগতিক উচ্চ শিক্ষা দান করার সুযোগ তার ছিলো, বরং বলা যায় অবারিত সুযোগ ছিলো। কিন্তু তিনি নিয়ত করে রেখেছিলেন, সন্তানদের যদ্দুর সম্ভব দ্বীনী শিক্ষা দান করবেন, যেন তাদের আখেরাত নিরাপদ হয়, সেই সঙ্গে তার নিজের আখেরাতের জন্যও যেন তারা কাজে আসে।

আমার বয়স যখন বারো তেরো তখন আমাদের জেলায় একজন ইংরেজ কালেক্টর এলেন। জানা নেই, কী কারণে তিনি আব্বাজানের প্রতি খুব আন্তরিক ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন, আব্বাজান তার কোন সন্তানকেই জাগতিক শিক্ষা দান করেননি তখন খুব অবাক হলেন এবং তাকে উদ্বুদ্ধ করলেন, অন্তত আমাকে যেন স্কুলে পাঠানো হয়। তিনি বললেন, পাঁচ বছরে তো সে এন্ট্রান্স পাশ করে ফেলবে, তখন আমি তাকে নায়েব তহশীলদারের চাকুরী দিয়ে দেবো।

তখনকার যুগে নায়েব তহশীলদারি অনেক বড় ব্যাপার ছিলো। সেখান থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নতি করে ডেপুটি কালেক্টর পর্যন্ত হওয়া যেতো। আর এটাই ছিলো ভারতীয়দের জন্য চাকুরীর স্বর্ণশিখর। কালেক্টর হতে পারতো শুধু ইংরেজ।

আব্বাজানের রূহের উপর আল্লাহ তাআলা রহমতের বারিধারা বর্ষণ করুন; তিনি ইংরেজ কালেক্টরের পক্ষ হতে এমন 'সদয়' পরামর্শ পাওয়ার পরো

আমাকে ইংরেজী শিক্ষার পথে চালিত করতে রাজি হননি। বিষয়টি যখন আব্বাজানের কিছু নিঃস্বার্থ বন্ধুর কানে গেলো তখন তারা তাকে বারবার অনুরোধ করলেন যে, এমন সুযোগের অবশ্যই সদ্ব্যবহার করা উচিত। সন্তানের ভবিষ্যত নষ্ট করার কোন অধিকার তার নেই।

শেষে আব্বাজান তাদের বললেন, ঠিকই বলছেন, সন্তানের ভবিষ্যত নষ্ট করার অধিকার আমার নেই। আসল কথা হলো, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত যে, আমার জীবদ্দশায় সন্তানদের উপার্জনের কোন প্রয়োজন আমার হবে না, বরং ইনশাআল্লাহ আমিই তাদের ভরণ-পোষণ করতে পারবো। তবে মৃত্যুর পর কবরে আমার তাদের উপার্জনের প্রয়োজন হবে। সুতরাং তাদের আমি ঐ শিক্ষাই দান করবো যা কবরে আমার কাজে আসবে।

আব্বাজান এ নিয়তেই আমাকে দ্বীনী শিক্ষা দান করেছেন যে, আমি যেন দ্বীনের খিদমতে নিয়োজিত থাকি এবং আখেরাতে তা তার কাজে আসে। অর্থাৎ তিনি আমাকে আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করেছিলেন। সংসার জীবনে দীর্ঘ দিন তিনি আমার অর্থ-প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, বরং বলা যায় যত দিন বেঁচে ছিলেন, তিনি আমার পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন।

আমার ধারণা ও বিশ্বাস এই যে, আব্বাজানের ইখলাস ও নেক নিয়তেরই বরকত ও সুফল এই যে, আমি কোন বিত্তবান মানুষ নই, কিন্তু দুনিয়াতে আল্লাহ আমাকে ঈর্ষণীয় সচ্ছলতা দান করেছেন এবং এত সুখ-শান্তি ও প্রশান্তি দান করেছেন যা বড় বড় বিত্তশালীদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।

আলহামদু লিল্লাহ, জীবনের সকল প্রয়োজনই আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমার পূরণ হয়ে যায়। যদি আমি ডেপুটি কালেক্টর হতাম, এমনকি কালেক্টরও হতাম তাহলেও এমন শান্তির জীবন কিছুতেই আমার ভাগ্যে হতো না। এসবই ছিলো আব্বাজানের সেই ইখলাস ও নেক নিয়ত এবং 'ঈছার' ও কোরবানির ফসল।

আমার বিত্তশালী না হওয়ার কারণও কিন্তু আব্বাজানের একটি দু'আ। হজ্জের সফর থেকে ফিরে একদিন একান্তে তিনি আমাকে বলেছিলেন, সফর থেকে তোমার জন্য আমি কিছু আনিনি, তবে একটি দু'আ করে এসেছি এবং আশা করি ইনশাআল্লাহ তা কবুল হবে। আমি দু'আ করেছি, তোমার কাছে যেন সম্পদ না থাকে, তবে কখনো যেন অর্থকষ্ট না হয়। এটা প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। এখন পর্যন্ত আমার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার মু'আমালা এমনই যেমন আব্বাজান দু'আ করেছেন। আমার ধন ছিলো না, তবে আমি 'ধনী' ছিলাম, হাদীস শরীফে যেমন বলা হয়েছে–

لَيْسَ الْغِنٰى غِنَى الْمَالِ، إِنَّمَا الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ

(সম্পদের সচ্ছলতা আসল সচ্ছলতা নয়, আত্মার সচ্ছলতাই হলো আসল সচ্ছলতা।)

আলহামদু লিল্লাহ, আমার কাছে কখনো সম্পদ জমা হয়নি, তবে আমার কখনো কোন অর্থকষ্ট হয়নি। আমি আমার অবস্থার উপর অন্তর থেকে খুশী।

(অনুবাদকের কথা– আমার মত গোনাহগার বান্দার সঙ্গেও আল্লাহর মু'আমালা অনুরূপ। আমি আমার মরহূম আব্বাজানকে অনেকবার বলেছি, আব্বা, আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে অনেক সম্পদ দান করেন এবং আমি তা দ্বীনের পথে খরচ করতে পারি। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে এ দু'আ আমি আদায় করতে পারিনি। তিনি বলতেন, আমি তোমার জন্য সম্পদের দু'আ করবো না। আমি দু'আ করি, আল্লাহ সব সময় তোমার জরুরত পুরা করে দেন।

আব্বার জীবদ্দশায় যখন অভাবনীয়ভাবে আমার জরুরত পুরা হতো, আব্বা বলতেন, 'দেখছনি আব্বু! আল্লায় তোমার জরুরত পূরা করছেনি! তারপরো আমি বলতাম, আব্বা আমার জন্য..., আর তিনি একই কথা বলতেন।

তো আমার জীবনে আব্বার দু'আর বরকত দু'ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত যখন যে জরুরতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি আল্লাহ গায়ব থেকে তা পূরা করে দিয়েছেন, কখনো আসবাব দ্বারা, কখনো আসবাব ছাড়া।

দ্বিতীয়ত যখন আমার চাওয়া কোন জরুরত পূরা হয়নি তখন আল্লাহ তাআলা আমার দিলে এই ইতমিনান ঢেলে দিয়েছেন যে, আমি যেটাকে জরুরত ভেবেছি সেটা আসলে জরুরত ছিলো না, ছিলো জরুরতের ওয়াহম বা ভুল ধারণা। জরুরত হলে অবশ্যই আল্লাহ তা পূরা করতেন। রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বায়ানী ছাগীরা)

ভরসা করে দেখুন

আমার পেয়ারে ভাই! আবারও বলছি, এখনো যদি নিজেদেরকে আপনারা আল্লাহর জন্য ওয়াকফ করার নিয়ত না করে থাকেন তাহলে এখনই আগে বাড়ুন। আল্লাহর সঙ্গে এই মু'আমালাটি করে নিন, তারপর নিজেদের সেভাবে তৈয়ার করুন। আমি কসম করে বলছি, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতেও আপনাদের সঙ্গে বিশেষ মুআমালা হবে। সেই মু'আমালার প্রকৃত প্রকাশ তো ঘটবে আখেরাত। কারণ আখেরাতের জীবন হলো অনন্তকালের এবং আখেরাতই হলো চিরস্থায়ী প্রতিদানের জগত। কিন্তু এই দুনিয়াতেও আপনাদের প্রতি অলৌকিক ও গায়বি অনুগ্রহের প্রকাশ ঘটবে এবং ঘটতে থাকবে। যেহেতু এ

যুগে সর্বক্ষেত্রে আমরা দুর্বল। চারদিকে শর ও ফাসাদের ছড়াছড়ি, ফিতনার ভয়াবহ আগ্রাসন, সেহেতু আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার গায়বি মদদ ও সাহায্যও আগের চেয়ে অনেক বেশী। এখন আমাদের সামান্য আমলের অনেক বেশী আজর। কেন আপনারা কি পড়েননি সেই হাদীস–

عَنْ أَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ (فِىْ حَدِيْثٍ) : سَيَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقِلُّ عُلَمَاؤُهُ وَيَكْثُرُ خُطَبَاؤُهُ، مَنْ تَمَسَّكَ فِيْهِ بِعُشْرِ مَا يَعْلَمُ نَجَا

(مسند أحمد ٥ صـ ١٥٥)

(মানুষের সামনে এমন যামানা আসবে যখন আলিম কম হবে, বক্তা বেশী হবে। তখন যারা যদ্দুর জানে তার দশমাংশের উপর আমল করবে, নাজাত পেয়ে যাবে।)

আপনারা কি পড়েননি সেই হাদীস–

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِىْ فَلَهُ أَجْرُ شَهِيْدٍ

(আমার উম্মতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নাত আঁকড়ে ধরবে তার জন্য থাকবে শহীদের আজর।)

তদ্রূপ এখন আমাদের সামান্য মেহনত এবং সামান্য সবর-মোজাহাদার উপর অনেক বেশী গায়বী মদদ ও নোছরত নাযিল হয়ে থাকে। এটা শুধু আমার মত গোনাহগার মানুষের যিন্দেগির তাজরেবাই নয়, আল্লাহর নেক বান্দা যারা, তাদেরও সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। আপনারা একটু অগ্রসর হয়ে দেখুন, আল্লাহর কসম, প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করতে পারবেন যে, আল্লাহ তাআলা আপনাদের দিকে দৌড়ে আসছেন। জীবনের বিভিন্ন মোড়ে, বিভিন্ন যোগে-দুর্যোগে দেখবেন কীভাবে আল্লাহ তাআলা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এখন শুধু বিশ্বাস করছেন, তখন প্রত্যক্ষ করবেন যে, সত্যি আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন–

نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

কেউ যখন নিজেকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে, আল্লাহ তখন তার বান্দাদের দিলকে তার দিকে ধাবিত করে দেন। আসমান থেকে তখন ঘোষণা নেমে আসে, অমুক বান্দাকে তিনি ভালোবাসেন সুতরাং আহলে যামীনও যেন তাকে ভালোবাসে।

আপনি একবার সামান্য একটু আগে বেড়ে দেখুন না! একবার শুধু আল্লাহর জন্য হয়ে দেখুন না!

তো আপনাদের খিদমতে এবং আপনাদের মাধ্যমে দ্বীনী মাদারিসের সকল তালিবানে ইলমের খিদমতে আমার পহেলা আরয ও প্রথম নিবেদন এই যে, আপনারা নিজেদের পরিচয়, অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হোন। ইলমে দ্বীনের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও ফযীলত জানতে চেষ্টা করুন। বিরাছাত ও নিয়াবাতের মাকাম ও মরতবা কী তা অনুধাবনের চেষ্টা করুন। তারপর যদি এই মর্যাদাপূর্ণ পথে চলতে চান তাহলে পূর্ণ উদ্যম উদ্দীপনার সঙ্গে, জাগ্রত চিন্তা-চেতনার সঙ্গে এবং বিশুদ্ধ নিয়ত ও আত্মনিবেদনের সঙ্গে অগ্রসর হতে থাকুন। নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করুন, দ্বীনের খিদমতের জন্য ওয়াকফ করুন। আপনার যা কিছু শক্তি-সামর্থ্য, যোগ্যতা ও একাগ্রতা, তা এই পথে ব্যয় করুন। দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের জন্যই যেন হয় আপনার বাঁচা-মরা ও জীবন-মরণ। ইলমের জন্যই আপনি জীবন ধারণ করবেন এবং ইলমের জন্যই আপনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবেন।

এই যে আপনার নিয়ত ও শপথ, এটাকে বারবার স্মরণ করুন এবং ঝালিয়ে রাখুন। আমি তো আরয করবো যে, এ বিষয়ে মাঝে-মধ্যে আপনারা পরস্পর মোযাকারা করুন এবং প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য নির্জনে মোরাকাবা করুন, আত্মনিমগ্নতার সঙ্গে ধ্যান করুন যে, আমি নিজেকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করেছি, দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করেছি। আমি ওয়ারিছ হতে চাই ইলমে নবীর, আমলে নবীর এবং আখলাকে নবীর। আমি সরল পথে চলতে চাই এবং উম্মতকে সরল পথে পরিচালিত করতে চাই। এখন থেকে আমি শুধু আল্লাহর জন্য, অন্য কারো জন্য নই, নই অন্য কিছুর জন্য।

আর দু'আ করতে থাকুন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অবিচলতা দান করো। হে আল্লাহ! আমাকে তুমি তোমার জন্য করে নাও এবং তুমি হে আল্লাহ, আমার জন্য হয়ে যাও।

ইলমের প্রতি প্রেমনিমগ্নতা ও আত্মনিবেদন

আমার পেয়ারে ভাই! আমার নূরে নযর! আমার কালবো জিগার! তোমাদের প্রতি আমার দ্বিতীয় নছীহত এই যে, ইলমে দ্বীন সেই হাছিল করতে পারে এবং কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান সেই অর্জন করতে পারে যার অন্তরে রয়েছে ইলমের মুহব্বত এবং জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসা; যার দিলে রয়েছে ইলমের পিপাসা এবং জ্ঞানের তৃষ্ণা। ইলম তার ভিতরেই ঘর করবে যে ইলমের জন্য সবরকমের মেহনত মোজাহাদা করতে তৈয়ার থাকবে। জ্ঞান তাকেই সান্নিধ্য দান করবে যে জ্ঞানের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকবে।

দেখুন ভাই! মাদরাসার উছূল-কানুন মেনে চলা, উস্তাযের সঙ্গে নিয়ম ও যাবেতার সম্পর্ক রক্ষা করা, সবক পড়া, পরীক্ষা দেয়া, পাশ করে সনদ নেয়া– এগুলো আসল কাজ নয়। এভাবে গড়পড়তা মাওলানা হয়ত হওয়া যায়। সত্যিকারের আলিমে দ্বীন ও ওয়ারিছে নবী হওয়ার জন্য লাগে অন্য কিছু। সে জন্য লাগে মাজনুর দিল এবং ফারহাদের ইশক।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইলম দুনিয়াতে এনেছেন এবং যে দ্বীন ও শরী'আত রেখে গেছেন তার বিরাছাত ও উত্তরাধিকার লাভ করা এবং তার নিয়াবাত ও প্রতিনিধিত্ব-গৌরব অর্জন করা, এটা তো এমনই বিরাট নিয়ামত এবং এমনই অমূল্য সম্পদ যে, এজন্য চাই অনন্য সাধারণ এক প্রেমনিমগ্নতা। এজন্য চাই এমন ত্যাগ ও আত্মত্যাগ যার উদাহরণ আমাদের পূর্ববর্তীগণ আমাদের জন্য রেখে গেছেন। এই প্রেম ও ভালোবাসা, এই নিমগ্নতা ও তন্ময়তা এবং এই ত্যাগ ও আত্মত্যাগ যখন আপনার মধ্যে কিছু পরিমাণে হলেও আসবে তখনই আপনার উপলব্ধি হবে যে, কত বড় নিয়ামত এবং কত বিরাট সম্পদ আপনি অর্জন করতে যাচ্ছেন, কোন মহাধনে আপনি ধনী হতে চলেছেন। তখন আপনার ভিতরের হালাতে ইনশাআল্লাহ অনেক পরিবর্তন হবে, আপনি তখন অন্য মানুষ হয়ে যাবেন। আপনাকে যে দেখবে সেই বলবে, ঐ যে ইলমের আশিক, ইলমের সাচ্চা মাজনু!

এখন তো ইলমের জন্য সেই রকম মেহনত-মোজাহাদার যামানাই বাকি থাকেনি। সময়ের পরিবর্তনে, দ্বীনী মাদারিসের উপস্থিতি ও সংখ্যা-প্রাচুর্যের কারণে ইলম হাছিল করা এখন তো খুব সহজ হয়ে গেছে। এক যামানা তো এমন ছিলো যে, আল্লাহর বান্দাগণ ইলমের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে যেতেন; এমনকি একটি মাত্র হাদীছের খোঁজে হাজার হাজার মাইল সফর করতেন। তখন তো রেলগাড়ী ছিলো না, মোটরগাড়ী ছিলো না, জাহায ছিলো না, বিমান ছিলো না, আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থার কথা কারো কল্পনায়ও ছিলো না। ইলমের আশিক ইলমের তালাশে বের হতেন উটের পিঠে সওয়ার হয়ে, কিংবা শুধু পায়ে হেঁটে। ইলমের প্রতি মুহব্বত পথের সমস্ত কষ্ট তাদের জন্য সহজ করে দিতো। দূর অতীতের কথা না হয় থাক। ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর কথা, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর কথা, ইমাম গায্যালী, আল্লামা ইবনুল জাওযী, আল্লামা যাবীদী (রহ.)-এর কথা, সে-সব যুগের সে-সকল আলোকপ্রদীপের কথা না হয় থাক। নিকট অতীতের কথাই শুনুন। এখানেও ইলমের প্রতি ফানাইয়্যাত ও আত্মনিবেদনের এমন সব বিস্ময়কর কাহিনী রয়েছে যে আকল হায়রান হয়ে যায়! সুবহানাল্লাহ, কেমন আশিক ছিলেন তাঁরা ইলমের! কেমন আত্মনিবেদন ছিলো ইলমের প্রতি তাঁদের!

একজনের কথা শুনেছি; তিনি দিল্লীতে হাদীছ পড়তেন। দিল্লী ছিলো ইলমে হাদীছের মারকায। কিন্তু তখন সেখানে এখনকার মত মাদরাসা ছিলো না, যেখানে প্রায় সবরকম চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা থাকে, তবু অভিযোগ ও শিকায়াতের কোন হদ থাকে না। তখনকার তালিবে ইলমরা তো তেলের চেরাগও পেতো না। নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হতো। যাদের তেল কেনার পয়সা ছিলো না তারা কখনো পূর্ণিমার আলোতে কিতাব পড়তো, বিশ্বাস করুন, আমি গল্প বলছি না, আমি যার কথা শুনেছি, তিনি কখনো পূর্ণিমার আলোতে কিতাব পড়তেন, কখনো পড়তেন রাস্তার সরকারী লণ্ঠনের আলোতে। তবু তিনি পড়তেন, ইলমের প্রতি ইশকের তাগিদে, জ্ঞানের প্রতি ভালোবাসার টানে। প্রেম ও ভালোবাসা ছাড়া এটা কখনো হয় না, হতে পারে না। এই ইশক ও মুহব্বতেরই তো ফসল হলেন হযরত নানুতবী (রহ.), হযরত গাঙ্গোহী (রহ.), হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.), হযরত শায়খুল ইসলাম হোসায়ন আহমদ মাদানী (রহ.), হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.), হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস (রহ.) ও অন্যান্য। আল্লাহ তাঁদের সবার তুরবত ঠাণ্ডা রাখুন, আমীন।

তো আমার পেয়ারে ভাই! তোমাদের প্রতি আমার দ্বিতীয় নছীহত এটাই যে, ইলমে নববীর যে মহান উত্তরাধিকার তোমরা হাছিল করতে চাও সে পথে নিজেকে ফানা করে দাও, একজন আশিক ও প্রেমিক যেভাবে তার মাহবূবের জন্য সবকিছু ফানা করে দেয়। এমনিতে নিয়মের যে লেখা-পড়া ও পরীক্ষা এবং মাওলানা হওয়ার যে সনদ, তো তুমি নিজেও জানো যে, দুনিয়ার নযরে এর কোন মূল্য নেই। সুতরাং সেই ইলম হাছিল করো যে ইলমের মাধ্যমে দুনিয়ার সামনে তুমি নিজেই হয়ে যাবে দ্বীনের সনদ, ইলমের সনদ।

ইলমের রূহ তাকওয়া

আমার পেয়ারে ভাই! এর পর আমার তৃতীয় নছীহত বা আবেদন এই যে, একথা তো বারবার বলা হয়েছে এবং আশা করি, আপনারাও হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, কুরআন ও সুন্নাহর ইলম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীরাছ বা উত্তরাধিকার সম্পদ, আর উম্মতকে দ্বীনের উপর পরিচালিত করার যে নবুয়তি দায়িত্ব, সেই দায়িত্বের নিয়াবত বা প্রতিনিধিত্ব করা, এটা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার অতি খাছ নিয়ামত। তো এই রূহানী সম্পদ ও নিয়ামত শুধু মেধা ও প্রতিভা দ্বারা এবং শুধু মেহনত ও পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। দুনিয়ার অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা এবং তাতে কামাল ও পূর্ণতা অর্জন করা মেধা ও মেহনত দ্বারা সম্ভব হলে হতেও পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া ইলম হচ্ছে এক আসমানি নূর, আর নবীর

বিরাছাত ও নিয়াবাত হচ্ছে এক আসমানি মর্যাদা। সুতরাং এটা অর্জন করার জন্য মেধা ও মেহনত ছাড়াও আরেকটি জিনিস হচ্ছে অপরিহার্য শর্ত। সেটা হচ্ছে কলবের তাকওয়া। তাকওয়া ছাড়া ইলমের নূর এবং বিরাছাতে নবীর মর্যাদা হাছিল হওয়া অসম্ভব।

তাকওয়ার খোলাছা মতলব হচ্ছে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা এবং আল্লাহকে মুহব্বত করা। আল্লাহকে ভয় করে এবং আল্লাহকে মুহব্বত করে তাঁর আদেশ-নিষেধ পূর্ণরূপে মেনে চলার চেষ্টা করা। এটাই হলো তাকওয়া, যার কথা কুরআনে হাদীছে বারবার বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। এমন জীবন গড়ে তোলার চেষ্টা করুন যাতে রয়েছে তাকওয়ার পাকিযিগি ও পবিত্রতা, যাতে রয়েছে আল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুকের তাজাল্লি ও জ্যোতির্ময়তা।

আল্লাহ তাআলা যে আমাদের জন্য বিভিন্ন ইবাদত নির্ধারণ করেছেন, যেমন নামায, রোযা, তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদি, এগুলো হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুক বা সম্পর্ক স্থাপনের বিশেষ মাধ্যম। আল্লাহ তাআলা যেহেতু বান্দাকে মুহব্বত করেন সেহেতু তিনি বান্দাকে তার সঙ্গে তাআল্লুক পয়দা করার মাধ্যম দান করেছেন। তবে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আমার নামায-রোযা, আমার যিকির ও তিলাওয়াত এবং আমার অন্যান্য ইবাদত তখনই আল্লাহর সঙ্গে আমার খাছ তাআল্লুক পয়দা করতে সক্ষম হবে যখন সেগুলো জানদার হবে; আমাদের ইবাদত যখন ছূরত না হয়ে হাকীকত হবে। ছুরত এক জিনিস, হাকীকত অন্য জিনিস। রন্ধন-প্রণালী শিক্ষার বই দেখেছি, সেখানে বিভিন্ন খাবারের সাজানো ডিসের ছবি আছে, কিন্তু তাতে কি স্বাদ আছে? তাতে কি ক্ষুধা দূর হয়? হয় না, কারণ এগুলো খাদ্য নয়, খাদ্যের ছবি মাত্র। আসল খাদ্য যখন তোমার সামনে রাখা হবে তখন তার ঘ্রাণেও স্বাদ, মুখে দিলেও স্বাদ, আবার তা ক্ষুধাও দূর করবে। ছবি ও হাকীকতের এই হলো পার্থক্য। তো আমাদের ইবাদত যেন রসমের ইবাদত না হয়, শুধু বাহ্যিক আকার-আকৃতির ইবাদত না হয়। তাতে যেন রূহ ও হাকীকত থাকে। তাহলেই ইবাদত দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, খালিকের সঙ্গে মাখলুকের তাআল্লুক ও মুহব্বত পয়দা হবে।

এই সফরে কয়েক দিন ধরে আমি গুজরাটেরই বিভিন্ন মাদরাসায় ঘুরছি। আমি দেখেছি, দেখে খুশী হয়েছি, ফজরের জামাতে তালিবানে ইলমের হাযিরিতে মসজিদ ভরে যায়। দিল-কলিজা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ফজরের পর সবাই কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে যায়। তিলাওয়াতের দৃশ্য যেমন সুখকর তেমনি তার আওয়ায ও ধ্বনি-গুঞ্জনও শ্রুতিমধুর। আলহামদু লিল্লাহ অবশ্যই এটি শোকরের বিষয়। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে একবার ভেবে দেখুন, আমাদের নামায ও

তিলাওয়াত কি তেমন হয় যেমন হওয়ার কথা তালিবানে ইলমের। আমাদের নামায-তিলাওয়াতে কি সেই রূহ ও হাকীকত রয়েছে যেমন থাকার কথা ওয়ারিছীনে নবীর নামাযে, তিলাওয়াতে? যদি তাই হয় তাহলে তো বড় আনন্দ ও সৌভাগ্যের কথা। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা এই যে, আমাদের দ্বীনী মাদারিসের তালিবানে ইলমের নামায ও তিলাওয়াত সাধারণ মুসলমানদের নামায-তিলাওয়াত থেকে কিছুমাত্র উন্নত নয়, যারা সূরা-কিরাতের অর্থ জানে না, ছানা-তাছবীহ ও তাকবীরের মর্ম বোঝে না। আমাদের নামায ও তাদের নামায একেবারে একরকম, কোন পার্থক্য নেই, বরং হয়ত তাদের নামায-তিলাওয়াত আমাদের চেয়ে উত্তম।

কেমন হবে আমাদের নামায-তিলাওয়াত?

আমার পেয়ারে ভাই! হয়ত আপনারা মিশকাত শরীফে এই হাদীছটি পড়েছেন–

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ

তোমাদের কেউ যখন ছালাত আদায় করে তখন আসলে সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে 'আলাপ' করে (এবং তার মনের কথা বলে)।

হয়ত সেই হাদীছটিও পড়েছেন, যাতে বলা হয়েছে–

নামাযে বান্দা যখন সূরা ফাতিহা পড়ে তখন প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা সাড়া দেন। যখন বান্দা বলে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন–

حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ

(আমার বান্দা আমার 'হামদ' করেছে।)

বান্দা যখন বলে–

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তখন আল্লাহ বলেন–

أَثْنٰى عَلَيَّ عَبْدِيْ

(আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে।)

বান্দা যখন বলে–

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

তখন আল্লাহ বলেন–

مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ

(আমার বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করেছে।)

সুতরাং আল্লাহর ওয়াস্তে ভেবে দেখুন, যারা এই হাদীছ পড়েছেন এবং ইলমে দ্বীনের এই স্তরে পৌঁছেছেন যে, নামাযে পঠিত বিষয়ের অর্থ ও মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাদের নামায যদি ঐ লোকদের মত হয় যারা হাদীছ জানে না, আয়াতের অর্থ বোঝে না তাহলে তা কতটা মর্মান্তিক! তাদের জন্য তা কত বড় ক্ষতি ও খাসারার কারণ! নামায পড়েও আসলে তারা নিজেদের উপর কত বড় যুলুম ও অবিচার করছেন। এমন নামাযের মিছাল তো ঐ লোকের মত যার কাছে তার প্রিয়তমের পত্র আছে কিন্তু সে পত্রটির কথা ভুলেই গেলো। কখনো পড়ে দেখলো না যে, প্রিয়তম তাকে সম্বোধন করে কী লিখেছে!

আমার পেয়ারে ভাই! আল্লাহ তাআলা তো আপনাদেরকে এমন নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করেছেন যে, আপনারা নামায পড়বেন, আর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কথা বলার স্বাদ গ্রহণ করবেন। আপনারাই বলুন, আল্লাহর সঙ্গে আলাপওয়ালা নামায কেমন স্বাদের নামায হতে পারে!

আপনার নামায তো এমন হবে যে, আপনি যখন বলবেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তখন আপনি গায়ব থেকে শুনতে পাবেন حَمِدَنِىْ عَبْدِىْ এর খোশখবর! একই ভাবে শুনতে পাবেন– أَثْنٰى عَلَىَّ عَبْدِىْ এবং مَجَّدَنِىْ عَبْدِىْ এর সাওগাত! তদ্রূপ যখন আপনি বলবেন–

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

(আপনারই ইবাদত করি আমরা এবং আপনারই সাহায্য চাই।)

তখন আপনার হৃদয় শুনতে পাবে গায়বের এ আশ্বাসবাণী–

هٰذَا بَيْنِىْ وَبَيْنَ عَبْدِىْ، وَلِعَبْدِىْ مَا سَأَلَ

(অর্থ ঃ এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে ... এবং আমার বান্দা যা চেয়েছে তা অবশ্যই দিবো।)

তদ্রূপ যখন আপনি তিলাওয়াতে মগ্ন হবেন তখন আপনার ধ্যান হবে এই যে, আল্লাহ আপনাকে দেখছেন এবং খুশী হয়ে আপনার তিলাওয়াত শুনছেন! আপনি বুঝতে পারবেন, আল্লাহ তাআলা কোথায় কী বলছেন! আপনাকে সম্বোধন করে আপনার কাছে কী চাচ্ছেন! 'ইয়া ইবাদী' বলে যখন আল্লাহ নেদা করবেন তখন আপনার প্রাণ-মন শীতল হয়ে যাবে।

আযাব ও গযবের আয়াতে আপনার ভিতরটা ভয়ে কেঁপে ওঠবে এবং আপনি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইবেন। আর নায-নেয়ামতের আয়াতে আপনার মন খুশিতে বাগবাগ হবে এবং আপনি আল্লাহর কাছে জান্নাতের আরযু জানাবেন।

হাদীছ ও সীরাতের কিতাবে আপনারা নিশ্চয় পড়েছেন যে, এমনই ছিলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায এবং এমনই ছিলো তাঁর তিলাওয়াত।

তো আপনারা যদি শুধু এতটুকু করেন যে, যেখানে আপনাদের নামায পড়া উচিত সেভাবে নামায পড়েন এবং যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিত সেভাবে তিলাওয়াত করেন। অর্থাৎ শুধু নামায ও তিলাওয়াতের ক্ষেত্রেই যদি আপনারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায ও তিলাওয়াতের বিরাছাত ও নিয়াবাত বা উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধিত্ব অর্জন করতে পারেন তাহলে আমি বলছি, আপনাদের আর কিছু লাগবে না। এতটুকুই যথেষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুক পয়দা হওয়ার জন্য এবং আল্লাহর গায়বী মদদ ও নোছরত নাযিল হওয়ার জন্য। আর যদি এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণ যিকির-তাসবীহের অভ্যাসও করে নেন তাহলে তো ইনশাআল্লাহ 'নূরুন আলা নূর' হয়ে যাবে।

আল্লাহর ওয়াস্তে এপথে একবার চলতে শুরু করেন, তারপর দেখুন, আল্লাহর পক্ষ হতে কী মু'আমালা হয় আপনার সঙ্গে। আমার পেয়ারে ভাই! এটাই বেলায়েত বা অলী হওয়ার রাস্তা, যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমার কোন অলীর সাথে (খাছ বান্দার সাথে) যদি কেউ শত্রুতা পোষণ করে তাহলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম।

ছাত্রকালে বাইআত হওয়া না হওয়া

হয়ত আপনার বড়দের কাছে শুনেছেন, বা কোন কিতাবে পড়েছেন যে, হযরত গাঙ্গোহী (রহ.) এবং আমাদের অন্যান্য আকাবির ছাত্রদেরকে বাইআত করতেন না। যতক্ষণ না তাদের প্রথাগত ছাত্রত্বের অবসান হতো, তাদেরকে তাঁরা সুলূক ও আধ্যাত্মিক সাধনার পথের যিকির-শোগল থেকে বিরতই রাখতেন। স্বয়ং হযরত থানবী (রহ.) নিজের ঘটনা লিখেছেন যে, ছাত্র যামানায় তিনি

হযরত গাঙ্গোহী (রহ.)-এর কাছে বাইআতের দরখাস্ত করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা কবুল করেননি, বরং বলে দিয়েছিলেন যে, এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। অর্থাৎ শয়তান তলবে ইলমের নিমগ্নতা থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য বাহ্যত একটি নেক চিন্তা মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহর গভীর ইলম অর্জন করা থেকে মাহরূম রাখা।

এ বিষয়ে আসল কথা এই যে, তখনকার বাইআত এখনকার মত ছিলো না। তখন বাইআত হওয়ার পর মুরীদকে সুলূক ও আধ্যাত্মিকতার দীর্ঘ সাধনায় নিয়োজিত করা হতো। যিকিরের লম্বা লম্বা অযীফা দেয়া হতো, সেই সঙ্গে শুরু হয়ে যেতো মুজাহাদা ও আত্মদমনের কঠিন এক সিলসিলা। তারপর সালিক-এর ভিতরে দেখা দিতে শুরু করতো মোজাহাদার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এবং আধ্যাত্মিক জগতে তারাক্কির বিভিন্ন মারহালা অতিক্রম করার ধারাবাহিকতা। এর অনিবার্য ফল এই হতো যে, ইলমের প্রতি মনোনিবেশ ও নিমগ্নতা হ্রাস পেতো, বরং লোপ পেতো। যিকিরের মযা পাওয়ার কারণে ইলমী মেহনতকে তখন মনে হতো বে-মযা। কারণ যারা যিকিরের স্বাদ পেয়ে যায় তাদের কাছে সবকিছু বিস্বাদ হয়ে যায়। তখন হিদায়া, তাওযীহ, তালবীহ, বায়যাবী, উমূরে আম্মাহ ও খায়ালী-এর মত জটিল ও রসহীন কিতাবে মন বসানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এককথায় তার জীবন ও জগত তখন অন্যরকম এবং অন্যকিছু হয়ে যায়।

তো ছাত্রকালেই যদি হযরত থানবী (রহ.)কে বাইআতের মাধ্যমে সুলূক ও আধ্যাত্মিক সাধনার রহস্যময় জগতে নিয়ে আসা হতো এবং যিকির-আযকার ও মোরাকাবা-মোজাহাদায় নিয়োজিত করা হতো তাহলে তিনি উচ্চস্তরের একজন ছাহিবে দিল বুযুর্গ অবশ্যই হতেন, কিন্তু ইলমের প্রশস্ততা ও গভীরতা কিছুতেই অর্জিত হতো না, যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছেন। এই 'পুরফিতান' যামানায়, এই চরম দ্বীনী দুর্যোগের সময় উম্মত একজন হাকীমুল উম্মত এবং মুজাদ্দিদে মিল্লাত পেতো না; এত শত 'রাহনুমা' কিতাব তার কলম থেকে এবং এত অসংখ্য 'হিদায়াতনুমা' বয়ান তার যবান থেকে বের হতো না, যা আজ পথহারা উম্মতকে সরল পথের দিশা দান করেছে এবং বহু যুগ পর্যন্ত করে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তো এ কারণেই হযরত গাঙ্গোহী (রহ.) এবং আমাদের অন্যান্য আকাবির ইলমে দ্বীনের তলবে নিয়োজিত কোন তালিবকে বাইআত করতেন না এবং সুলূকের সালিক হওয়ার অনুমতি দিতেন না, যাতে তারা আধ্যাত্মিক সাধনা ও রূহানি মোজাহাদার জগতে ডুবে গিয়ে ইলমে দ্বীনের গভীরতা থেকে বঞ্চিত না হন। কিছুতেই এটা এজন্য ছিলো না যে, তালিবে ইলমের তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন নেই এবং তাআল্লুক মাআল্লাহর জরুরত নেই।

আরেকটি কথা এই যে, তখন এত মাদরাসা ছিলো না, এত জাঁকজমক ও জৌলুস ছিলো না, আবার এমন নিষ্প্রাণ ও নির্জীব অবস্থাও ছিলো না। একটি দু'টি মাদরাসা ছিলো। দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরেরও পয়লা যামানা ছিলো। আমরা আমাদের বড়দের কাছে শুনেছি, তখন অবস্থা এমন ছিলো যে, দারুল উলূম দেওবন্দের 'দারবান' ও দরজার পাহারাদারও ছিলেন ছাহিবে নিসবত বুযুর্গ। এমন সাধারণ মানুষেরও তখন ছিলো আল্লাহর সঙ্গে খাছ নিসবত ও গভীর সম্পর্ক। চোখে তিনি দরজা পাহারা দিতেন, হাতে দরজা খুলতেন, বন্ধ করতেন, আর মুখে আল্লাহ! আল্লাহ! যিকির করতেন। সে বড় নূরানিয়াতপূর্ণ যামানা ছিলো। মাতবাখে যিনি তালিবানে ইলমের খাবার রান্না করতেন তার হাতে রান্না-করা খাবারেও যিকিরের নূরানিয়াতের আছর পয়দা হতো, এমনই রূহানিয়াতপূর্ণ মা-হাওল ও পরিবেশ ছিলো। যে কোন আগন্তুক মাদরাসায় দাখেল হওয়ামাত্র তাকওয়া ও লিল্লাহিয়াতের খোশবু অনুভব করতো। তার মনে হতো, রূহানিয়াতের কোন গুলবাগে সে দাখেল হয়েছে।

মোটকথা, যে স্তরের তাকওয়া-তাহারাত, তাযকিয়া ও আত্মশুদ্ধি এবং যে স্তরের তাআল্লুক মাআল্লাহ তালিবে ইলমির যামানায় প্রয়োজন সেটা মাদরাসার নূরানি পরিবেশ থেকেই হাছিল হয়ে যেতো।

আমার উস্‌তায ছিলেন হযরত মাওলানা কারীম বখ্‌শ সাম্ভলী (রহ.)। এদিক থেকে আমি বড় অনুগ্রহপ্রাপ্ত ছিলাম যে, অধিকাংশ দরসী কিতাব তাঁর কাছেই আমার পড়া হয়েছে। তিনি আমার তালীমী মুরুব্বী এবং শিক্ষা-অভিভাবকও ছিলেন। আমার আব্বাজান (রহ.) আমাকে আল্লাহর নামে তাঁর হাতে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। আমি দীর্ঘ চার বছর তাঁর কাছে এমনভাবে ছিলাম যে, শুধু পড়া-লেখাই নয়, বরং আমার থাকা-খাওয়া ও আহার-নিদ্রাও ছিলো তাঁর কামরায়। তিনি তাঁর ছাত্রজীবনের শুধু শেষ দু'বছর দারুল উলূম দেওবন্দে কাটিয়েছেন। তিনি হযরত মাওলানা হোসায়ন আহমদ মাদানী (রহ.) এবং হযরত মুফতী কিফায়াতুল্লাহ (রহ.)-এর হামসবক ও সহপাঠী ছিলেন। তিনি হযরত গাঙ্গোহী (রহ.)-এর যামানাও পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও, আমার জানা নেই, কী কারণে তিনি সুলূক ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি তেমন মনোনিবেশ করেননি, এমনকি তিনি কোন বুযুর্গের হাতে বাইআত পর্যন্ত হননি। কিন্তু শুধু দু'টি বছর দারুল উলূম দেওবন্দের রূহানি ও নূরানি পরিবেশে থাকা এবং হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) ও অন্যান্য আসাতিযা কেরামের ছোহবত ও সান্নিধ্য লাভ করার বরকত এবং তাঁদের প্রতি ভক্তি-মুহব্বতের সুফল এই ছিলো যে, তাঁর তাকওয়া-তাহারাত ও আত্মশুদ্ধি ছিলো তাঁর পরিচিত মহলে দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁর তাকওয়া-তাহারাত ও রূহানিয়াত যদি আমার হাছিল হতো তাহলে তো আমি মনে করতাম, আমার সবকিছু হাছিল হয়ে গেছে।

বন্ধুগণ, যামানা এখন অনেক বদলে গেছে। এখন আমাদের মাদরাসাগুলোতে আয়োজন অনেক, জৌলুস অনেক, ছাত্রসংখ্যাও অনেক, কিন্তু আগের সেই পরিবেশ আর নেই। আসলে কী আছে, আর কী নেই, তা খুলে খুলে বলার দরকারও নেই। সবকিছু তো আমার আপনার সামনেই রয়েছে। চোখ খুলে যে কেউ দেখতে পারে, এমনকি এখন তো চোখ বন্ধ করেও দেখা যায়! আগে মাদরাসার বাইরে যে পরিবেশ ছিলো, এখন মাদরাসার ভিতরেই যেন তার চেয়ে মন্দ পরিবেশ! আল্লাহ ছাড়া কার কাছে মনের দরদ-ব্যথার অভিযোগ জানাবো! আল্লাহ ছাড়া কে আছে শিকায়াত এবং দিলের যখমে মরহম দেয়ার!

তো এ কারণেই হযরত গাঙ্গোহী (রহ.)-এর খলীফাগণ এবং তাদের পরবর্তীগণ কর্মপন্থায় পরিবর্তন এনেছেন এবং তালিবে ইলমদেরও বাইআত গ্রহণ করা শুরু করেছেন।

তাই আপনাদের প্রতি আমার মুখলিছানা মাশওয়ারা ও হামদারদানা গোযারিশ এই যে, এখন থেকেই আপনারা কোন ছাহিবে নিসবত বুযুর্গের সঙ্গে নিসবত কায়েম করে নিন এবং পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁর হেদায়াত অনুসরণ করে আল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুক পয়দা করুন। আল্লাহর সঙ্গে তো একজন সাধারণ মুমিনেরও তাআল্লুক রয়েছে, যার্রা বরাবর ঈমান যার আছে তারও আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু যারা নবীর ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারী হবেন, যারা উম্মতের হিদায়াত ও রাহনুমায়ির মহাদায়িত্ব পালন করবেন তাদের জন্য প্রয়োজন আল্লাহর সঙ্গে অতি উচ্চস্তরের তাআল্লুক। তাদের তো হতে হবে আউলিয়াউল্লাহ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন–

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(শোনো, আল্লাহর আউলিয়া যারা তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।)

কম সে কম নামায-তিলাওয়াতের ইহতিমাম তো অবশ্যই করবেন। আপনার নামায হবে হাকীকত ও রূহানিয়াতওয়ালা নামায যেখানে আপনি আলহামদু লিল্লাহ বলবেন, আর মাওলা 'হামিদানী আবদী' বলবেন।

আপনার তিলাওয়াত হবে নূরানিয়াতওয়ালা জানদার তিলাওয়াত, যেখানে আপনি হবেন পড়নেওয়ালা, আর স্বয়ং আল্লাহ তাআলা হবেন 'সুননেওয়ালা'!

এতটুকু হতেই হবে এ পথের চলা অব্যাহত রাখার জন্য এবং শয়তান ও শয়তানিয়াত থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য। আর সঙ্গে যদি সামান্য পরিমাণ যিকির-আযকারের প্রতিও মনোনিবেশ করেন তাহলে তো সেটা হবে 'নূরুন আলা নূর'।

এ বিষয়ে তোমরা উদাসীন ও গাফেল থাকো। যদি তোমাদের নামায যিন্দা ও বা-হাকীকত না হয়, যদি তোমাদের তিলাওয়াত জানদার ও জ্যোতির্ময় না হয়; তোমাদের নামায যদি হয় গাফলাতের নামায, তোমাদের তিলাওয়াত যদি হয় মুরদা তিলাওয়াত তাহলে... বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে তবু বলতে হবে, তাহলে তোমরা পড়বে তো বুখারী, মুসলিম, জালালাইন, মিশকাত, হেদায়া ও বায়যাবী, কিন্তু শয়তান হবে তোমাদের সঙ্গী, ইবলীস হবে তোমাদের রাহবার। সুতরাং পরিণাম ও আনজাম কী হতে পারে তা তো বলাই বাহুল্য। হে আল্লাহ, আমার যা দায়িত্ব ছিলো আমি তা বলে দিয়েছি, এখন আপনি আমাকে এবং আমার তালিবানে ইলম ভাইদেরকে সমস্ত ফিতনা ফাসাদ থেকে হিফাযত করুন। ইলমের পথে এবং দ্বীনের সহজ-সরল পথে অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন।

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! একটা কথা খুবই পরিষ্কার, আলিম-ওলামা এবং তালিবানে ইলম নামে পরিচিত আমাদের যে সম্প্রদায়, আমাদের সামনে দু'টিমাত্র পথ খোলা! হয় আমরা যাবো প্রথম পথে, কিংবা যেতে হবে দ্বিতীয় পথে, তৃতীয় কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। হয় আমরা আল্লাহওয়ালা হবো; হয় আমরা, যাঁকে মুআল্লিম ও শিক্ষকরূপে প্রেরণ করা হয়েছে সেই بُعِثْتُ مُعَلِّمًا এর পথে চলবো এবং তাঁর সুন্নতের উপর অবিচল থাকবো; হয় আমরা আছহাবে ছুফফার পথ অনুসরণ করবো, যাঁরা জীবনের সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন ইলমের জন্য, যারা ইলমের জগতে যেমন ছিলো সুউচ্চ মিনার তেমনি তাকওয়া ও রূহানিয়াতের জগতেও ছিলেন সমুজ্জ্বল মিনার; হয় আমরা এ পথে চলবো এবং আল্লাহর প্রিয়পাত্র হয়ে দুনিয়াতে ইয্যতের যিন্দেগি হাছিল করবো এবং আখেরাতের লা-হিসাব, লা-মাহদূদ যিন্দেগিরও কামিয়াবি হাছিল করবো, নচেৎ আল্লাহ না করুন, চলতে হবে শয়তানের পথে, ইবলীসের মুক্তাদি হয়ে, হাদীছ শরীফে যাদেরকে বলা হয়েছে ওলামায়ে সূ ও নিকৃষ্ট আলিম। আপনারা তো সবই জানেন, একটু স্মরণ করুন, ওলামায়ে সূ সম্পর্কে কী কঠিন পরিণাম ও পরিণতির হুঁশিয়ারি এসেছে হাদীছ শরীফে যবানে নবুয়তে!

তো আমাদের সামনে দু'টি পথ শুধু খোলা আছে, তৃতীয় কোন পথ নেই। এ জন্য আমি বলছি, এখন থেকেই আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করুন, আল্লাহকে ভালোবাসুন, তাকওয়া ও তাহারাত অবলম্বন করুন এবং ইলমের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে আত্মশুদ্ধির জন্যও কিছু না কিছু চেষ্টা করুন। অর্থাৎ যা কিছু আল্লাহ হারাম করেছেন, যা কিছু আল্লাহ তাআলা নোংরা ও খাবীছ বলে ঘোষণা করেছেন সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখুন, গোনাহ ও সাইয়িআত থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও তাআল্লুক এবং আল্লাহর রিযা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এটা হলো অপরিহার্য শর্ত। আলিম-ওলামা ও তালিবানে ইলমকে

তো বরং সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকেও পূর্ণ পরহেয করতে হবে। কারণ তারা তো উম্মতের মুক্তাদী তবকা নয়, তারা তো উম্মাতের ইমাম ও রাহনুমা তাবকা।

মনে রাখবেন, আল্লাহ্ তাআলার যাত ও সত্তা হচ্ছে অতি গায়রাত-ওয়ালা ও বে-মুহতাজ। তিনি হচ্ছেন গানী ও ছামাদ। যদি কোন ব্যক্তি ইলমের পথ বেছে নেয়ার পরও নোংরা ও খাবীছ জিনিস থেকে বেঁচে না থাকে, আল্লাহ্ তাআলার গায়রাতের খেয়াল না রাখে, আল্লাহ্ তাআলার গোছ্ছা আসে– এমন কাজ থেকে দূরে না থাকে তাহলে সে নিজেই যেন আল্লাহর সঙ্গে তাআল্লুক ও সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো এবং নিজের জন্য আল্লাহর রহমতের দরজা বন্ধ করে দিলো। তখন শয়তান তার উপর সওয়ার হতে আর কোন প্রতিবন্ধক নেই, জাহান্নাম থেকে তাকে বাঁচানেওয়ালা আর কেউ নেই। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের সবাইকে হিফাযত করো, আমাদের খাতা-তাকছীর মাফ করে দাও। আমাদেরকে তোমার খাছ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও, আমীন।

রহমত লাভের উপায় ঃ তাওবা-ইস্তিগফার

আমার ভাই ও বন্ধু! খোলাছা কথা হলো, আপনাদের মাকাম অতি উঁচা মাকাম। আপনাদের অবস্থান নবীর ওয়ারিছ ও উত্তরাধিকারীর অবস্থান এবং নবুয়তের নিয়াবাত ও প্রতিনিধিত্বের অবস্থান। এই উঁচা মাকাম ও অবস্থানের কথা সব সময় আপনাদের স্মরণ রাখতে হবে এবং উঁচু মাকাম ও দায়িত্বের জন্য ধীরে ধীরে নিজেকে তৈয়ার করতে হবে, উম্মতকে দ্বীনের পথে পরিচালিত করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। তালিবে ইলমির পুরা যামানা হলো সেই প্রস্তুতি ও তৈয়ারির যামানা।

তো কীভাবে নিজেকে তৈয়ার ও প্রস্তুত করবেন? হাঁ বন্ধুগণ, এ পথের তৈয়ারি ও প্রস্তুতির প্রথম শর্ত হলো গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা, হারাম ও নোংরা-খাবীছ জিনিস থেকে নিজেকে যথাসম্ভব পবিত্র রাখা। সেজন্য নিজেকে পাক-পবিত্র রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা হচ্ছে–

لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

(পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া অন্য কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না।)

যদিও এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, অযু-গোসলের তাহারাত ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে এর অন্তর্নিহিত মর্ম এটাও যে, যারা গোনাহের খাবাছাত ও গান্দেগি থেকে পবিত্র নয় তারা কুরআনের ইলম ও নূরানিয়াতের ধারেকাছেও আসতে পারবে না। তারা কিছুতেই কুরআনের ধারক-বাহক হতে পারবে না। সারা জীবন তারা মাদরাসায় পড়ে থাকুক, সারা জীবন তারা কিতাব পড়তে ও

পড়াতে থাকুক, আল্লাহর নযরে তো তারা অপবিত্র, গান্দা, খাবীছ, সুতরাং কুরআনের ধারক ও বাহক মর্যাদার তারা কিছুতেই অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং গোনাহ থেকে, খাবাছাত ও গান্দেগি থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতেই হবে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় বান্দার প্রতি অতি দয়াবান। গোনাহগার বান্দার জন্যও তিনি সান্ত্বনা রেখেছেন। পাপী বান্দার জন্যও তিনি নাজাতের রাস্তা খোলা রেখেছেন। সুতরাং কোন তালিবে ইলম ভাই যদি সাচ্চা দিলে নিয়ত করে এবং সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে যে, গোনাহ থেকে সে বেঁচে থাকবে, খাবাছাত ও গান্দেগি থেকে পাক-পবিত্র থাকবে, তারপর নফসের ধোকা এবং শয়তানের মকর-ফেরেবের কারণে গোনায় লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং খাবাছাত ও গান্দেগিতে নিজেকে 'দাগদার' করে ফেলে তবে তার নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া মুমিনের কাজ নয়। শয়তান তো এটাই চায় যে, বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে বরবাদির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাক, যেখান থেকে ফেরার কোন রাস্তা নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বান্দাকে অভয়বাণী শুনিয়েছেন–

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

(তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।) (তোমরা অনুতপ্ত হও, গোনাহ ছেড়ে দাও এবং তাওবা করো) আল্লাহ সব গোনাহ মাফ করে দেবেন।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা তো এতদূর বলেছেন, বান্দা যদি গোনাহ ও গান্দেগি দ্বারা আসমান-যমিন ভরে ফেলে, আল্লাহ তাআলা মাগফিরাত দ্বারা আসমান-যমিন ভরে ফেলবেন, কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ আবার কার পরোয়া করবেন? কে আছে, যে আল্লাহর মাগফিরাতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে!

তো ভাই! প্রথম কথা হলো, তালিবে ইলম তো আলহামদু লিল্লাহ এমন হবে না যে, সে গোনাহ দ্বারা, গান্দেগি ও খাবাছাত দ্বারা আসমান-যমিন বোঝাই করে ফেলবে। তার দ্বারা কখনো কখনো গোনাহ হয়ে যেতে পারে, কারণ নফসের হাতে, শয়তানের হাতে মানুষ বড় দুর্বল। তো গোনাহ হয়ে যাওয়ার পর তালিবে ইলম যদি নিজের গোনাহ বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়, নির্জনে আল্লাহর সামনে রোনাযারি করে এবং তাওবা-ইস্তিগফার করে তাহলে ইনশাআল্লাহ এটা তার জন্য ক্ষতিকর হবে না, বরং জীবনে বারবার এমন ঘটনা ঘটলেও নিরাশ হওয়ার কারণ নেই। কিন্তু শর্ত হলো, তাওবা ও ইস্তিগফার হতে হবে খাঁটি দিলে, খাছ নিয়তে, কুরআন মাজীদে যাকে বলা হয়েছে তাওবাতুন নাছুহ, আর আল্লাহ

তাআলা তো দিলের অবস্থা এবং নিয়তের হালত ভালোভাবেই জানেন। তিনি তো

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

জানেন চোখের চোরা চাহনি এবং বুকের ভিতরের গুপ্ত বিষয়। সুতরাং যদি খাঁটি দিলে ও খাছ নিয়তে তাওবা করা হয় তাহলে আর ভয় নেই। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

অর্থাৎ এমন বান্দারা খুবই প্রশংসার যোগ্য এবং তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মাগফিরাত ও জান্নাত লাভের ওয়াদা যাদের অবস্থা এই যে, তাদের দ্বারা যখন কোন অশ্লীল কাজ হয়ে যায়, কিংবা তারা অপরাধমূলক কোন গোনাহ করে ফেলে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে, আর নিজেদের গোনাহগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করে এবং মাফ চায়, আর আল্লাহ ছাড়া আছেই বা কে, যে গোনাহ মাফ করতে পারে। সুতরাং মাফ তো আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে এবং একমাত্র তিনিই মাফ করবেন। তবে তাদের অবস্থা এই যে, তারা যা করেছে তার উপর অনড় থাকে না, গোনাহ করে আনন্দ প্রকাশ করে না এবং দ্বিতীয়বার সেই গোনাহ করার ইচ্ছা পোষণ করে না, আর তারা জানে যে, তাদের কাজটা গোনাহ ছিলো এবং তাওবা-ইসতিগফার করা জরুরি ছিলো এবং আল্লাহ অবশ্যই তাওবা কবুলকারী।

এমনকি আলিমে রাব্বানি মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) তো এক পত্রে এতদূর লিখেছেন,

> ‘কোন কোন বান্দা এমনও আছেন যাদের উন্নতি ও তরক্কী এ পথেই হয়ে থাকে যে, তাদের দ্বারা গোনাহ হয়ে যায়, তারপর অনুতাপে অনুশোচনায় তাদের হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়, আর তারা ‘যারযার’ হয়ে আল্লাহর কাছে রোনাযারি ও তাওবা-ইসতিগফার করে। তখন তাদের মাকাম ও মরতবা এত উপরে উঠে যায় যা শুধু আমল-ইবাদত দ্বারা হতো না।’

গোনাহ থেকে বাঁচার মযবূত নিয়ত ও সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করার পর নফসের ধোকায় এবং শয়তানের প্ররোচনায় গোনাহ হয়ে যাওয়া, তারপর অনুতপ্ত হৃদয়ে সাচ্চা দিলে তাওবা-ইসতিগফার করে নেয়া, এটা ক্ষতিকর তো নয়ই, এমনকি বিলায়াত ও বুযুর্গীরও খেলাফ নয়, বরং অনেক সময় এটা তোমার রূহানী তরক্কিরও ওছীলা হতে পারে। কোন মানুষ যত বড় অলি-বুযুর্গ হোন, তিনি মাছূম বা নিষ্পাপ নন; মাছূম ও নিষ্পাপ তো হলেন শুধু নবী-রাসূলগণ এবং আসমানের ফেরেশতাগণ। সেটাও আল্লাহর পক্ষ হতে দান করা 'ইছমত'গুণের কারণে।

তো ইছমত ও নিষ্পাপতা হলো নবী-রাসূল ও ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। এছাড়া আর কোন মানবব্যক্তিত্ব মাছুম বা নিষ্পাপ নয়। যে কারো দ্বারা যে কোন সময় যে কোন গোনাহ হয়ে যেতে পারে, তবে খুব মনে রাখতে হবে, খুব সাবধান থাকতে হবে, নিশ্চিন্ত মনে, নির্ভয়ে গোনাহ করতে থাকা, গোনাহ করে আনন্দিত হওয়া এবং তাওবা না করে একই গোনাহ আবার করার চিন্তায় থাকা, এটা খুবই ভয়াবহ, এটা হালাকাত ও বরবাদির কারণ। এতে আল্লাহ তাআলা 'গযবনাক' হন, এতে বান্দার জন্য আল্লাহর রহমতের দরওয়াযা বন্ধ হয়ে যায়।

আমার পেয়ারে ভাই! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা নিজেদের সাথে পরিচিত হোন, নিজেদের মাকাম ও মরতবা এবং অবস্থান ও মর্যাদা বুঝতে চেষ্টা করুন আপনারা আল্লাহ তাআলার খাছ জামাতে দাখিল হয়েছেন, যাদের বলা হয় হিযবুল্লাহ। আপনারা এখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈন্য-বাহিনীতে শামিল হয়ে পড়েছেন, যাদের বলা হয়, ওয়ারিছে নবী, নায়েবে রাসূল। এমন মহামর্যাদাপূর্ণ দ্বীনী মাকাম হাছিল করার পর যদি আপনারা দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মত গোনাহগারিতে লিপ্ত থাকেন, পাপাচারের প্রতি আসক্ত থাকেন, বরং গোনাহ ও পাপাচারে সাধারণ মানুষ থেকেও নীচে নেমে যান তাহলে আমি মাফ চাই আপনাদের মিছাল হবে সেই শাহযাদার মত যে শাহীবালাখানা ছেড়ে মেথরপট্টিতে গিয়ে মেথর-মেথরানিদের সাথে বসবাস করা পছন্দ করেছে। এমন নিকৃষ্ট রুচি থেকে আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাযত করুন, আমীন।

আল্লাহ যদি অনুগ্রহ করে আপনাদের অন্তর্দৃষ্টি দান করেন তাহলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন যে, গোনাহের খাবাছাত ও গান্দেগিতে 'লতপত' হয়ে যারা কুরআন শরীফ, বুখারী শরীফ সামনে নিয়ে বসে তারা যেন কুরআন শরীফ, বুখারী শরীফকে না-পাক, গান্দা গিলাফ দ্বারা জড়িয়ে রাখে। ভাই, হয় তুমি পাক-ছাফ হয়ে যাও, না হয় আল্লাহর ওয়াস্তে অন্তত কুরআন ও সুন্নাহর বেহুরমতি বন্ধ করো। এমন মানুষের ছোহবতের কষ্টে কুরআন-হাদীছ কাঁদতে থাকে, যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকে। আমার তোমার শোনবার মত কান নেই বলে শুনতে পাই না। নচেৎ অবশ্যই শুনতে পেতাম, কুরআন, হাদীছ এবং ইলমে দ্বীন

আল্লাহর কাছে এ রকম গান্দা ও খাবীছ মানুষের ছোহবত থেকে পানাহ চাইতে থাকে। তবু আল্লাহ তাআলা মেহেরবান বলে বান্দাকে শেষ পর্যন্ত সুযোগ দিতে থাকেন। আল্লাহ যেন তার পাক কালামকে তাসাল্লী দিয়ে বলেন, 'তুমি একটু সবর করো, দেখি, আমার বান্দা ঠিক হয়ে যায় কি না, তাওবা-ইসতিগফার করে কি না। তুমি আমার খাতিরে আমার বান্দার গান্দেগি একটু বরদাশত করে নাও।'

আমি আবারো বলছি, নিজেদের চিনতে চেষ্টা করুন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে তাআল্লুক ও সম্পর্ক মযবূত করুন। অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা পোষণ করুন। গোনাহ থেকে বেঁচে থাকুন এবং তাওবা-ইসতিগফার করতে থাকুন, তাহলে আপনারাই হবেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ জামাত, আপনিই হবেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

ইসলাহের মেহনত এখনই

আমার বহু তালিবে ইলম ভাই এভাবে চিন্তা করেন অথবা শয়তান তাদেরকে দিয়ে এভাবে চিন্তা করায় যে, এখন আমার বয়সই আর কত! মাত্র তো নওজোয়ানির শুরু! এখন তো খেলাধুলা, হাসি-তামাশা ও ভোগ-ফুর্তির সময়। এখন তো আমরা মোটে ছাত্র। নিজের ইসলাহের জন্য, নফসকে দমন করার জন্য এবং কোন বুযুর্গের সোহবত গ্রহণ করার জন্য সামনে দীর্ঘ সময় পড়ে আছে! সামনে গিয়ে আমরাও নফসের ইসলাহ ও সংশোধনের জন্য সাধনা ও মুজাহাদার যিন্দেগি ইখতিয়ার করবো।

তো আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, নিজের প্রতি আপনার এটা কত বড় অবিচার! এটা কি এমন ব্যক্তির ভাবনা হতে পারে, যিনি হবেন ওয়ারিছে নবী ও নায়েবে রাসূল! যার উপর যিম্মাদারি আসছে নিজের হিদায়াতের সঙ্গে সঙ্গে উম্মতেরও হিদায়াত ও রাহনুমায়ির! নফসের ধোকা আসলে বহুত খতরনাক, শয়তানের অস্ত্র আসলেই খুব 'শাণদার'!

এটা তো সাধারণ মুমিন-মুসলিমের জন্যও সঠিক চিন্তা নয়! কী ভরসা আছে আগামীকাল বেঁচে থাকার! গোনাহে 'লতপত' অবস্থায় যদি মউত এসে যায়! আপনার মত কত জোয়ান তালিবে ইলম বিশ পঁচিশ বছর বয়সেই মউতের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছে! আরে, বুড়ো বয়সে তো সবাই তাওবা করে, হাতে তাসবীহ নেয় এবং মসজিদে পড়ে তাকে৭ সেটাও ভালো; সেটাও তাওফীকের কথা। অনেকের তো বুড়ো বয়সেও তাওবা নসীব হয় না। কিন্তু আপনি তো তালিবে ইলম, আপনি তো আগামী দিনের ওয়ারিছে নবী, নায়েবে রাসূল! আপনি তো সেই হাদীছ পড়েছেন, বা শুনেছেন, যেখানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

'সাত প্রকার বান্দা কিয়ামতের দিন আরশের ছায়া লাভ করবে, যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদেরই একজন হলো–

شَابٌّ نَشَأَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ

(এমন যুবক যে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের উপর প্রতিপালিত হয়েছে।)

সুতরাং এত দিন পর্যন্ত যদি আপনি সচেতন না হয়ে থাকেন তাহলে অন্তত এখন নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীছ শুনে নিয়ত করে নিন, আপনি আপনার জোয়ানির বাকি সময়গুলো আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের ছায়ায় অতিবাহিত করবেন, যাতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে আরশের ছায়া দান করেন।

আমার জোয়ানি তো চলে গেছে, আমার বয়স তো সত্তর পার হতে চলেছে। আপনারা তো জোয়ান। এখনো আপনাদের জোয়ানি বাকি আছে। জোয়ানির ইবাদত দ্বারা আরশের ছায়া লাভ করার সুযোগ আপনাদের আছে। নিয়ম মত আমি চাইলেও আর এ নেয়ামত হাসিল করতে পারবো না, তবে আল্লাহর রহমত থেকে আমিও নিরাশ নই। আমি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করি, আপনারা আমীন বলুন, আল্লাহ যেন আমার জোয়ানির সব খাতা-তাকছীর মাফ করে দিয়ে আমাকেও সেই ভাগ্যবান জোয়ানদের জামাতে শামিল করে নেন, যারা কিয়ামতের কঠিন দিনে আরশের ছায়ায় অবস্থান করবে, আমীন।

তো আল্লাহ যেন আমার পেয়ারা নওজোয়ান ভাইদেরকে তাওকীফ দান করেন, তারা যেন এখনি এই নিয়ত করে ফেলেন এবং তার উপর অবিচল থাকেন। এখন থেকেই গোনাহের পথ পরিত্যাগ করুন, এখন থেকেই নিজেদেরকে আল্লাহর ইবাদত, আনুগত্য ও ফরমাবরদারিতে নিয়োজিত করুন। কিয়ামতে আরশের ছায়ার জন্য এখনই লালায়িত হোন। ভাই, বড় মজা ও মৌজের দিন হবে সেটা যখন আল্লাহর নওজোয়ান বান্দাদের ডেকে ডেকে আরশের ছায়ায় নিয়ে যাওয়া হবে, আর লক্ষ কোটি জোয়ান আফসোসের নজরে তাদের দেখতে থাকবে!

দু'আ হলো নবীর গুণ

এখন আমি আরেকটি বিষয় আপনাদের খেদমতে আরয করতে চাই এবং দু'আ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে ও আপনাদের সবাইকে তাওফীক দান করেন। আপনারা তো হবেন ওয়ারিছে নবী এবং নায়িবে রাসূল! তো এই বিরাছাত ও নিয়াবাত হতে হবে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি আমলে, আখলাকে এবং তাঁর প্রতিটি গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে। নবী ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাআল্লুক ও মহব্বত হতে হবে এমন সুগভীর ও সুব্যাপ্ত যাতে তাঁর প্রতিটি আখলাক, গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আপনাদেরও সামান্য হিছ্ছা থাকে।

এ বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোনটি সর্বাধিক উজ্জ্বল। এমনিতে তো আল্লাহ তাআলা সকল বিষয়েই তাঁর পেয়ারা হাবীবকে কামাল ও পূর্ণতা দান করেছেন। কবির ভাষায়–

'আঁচে খোবাঁ হামা দারান্দ, তূ তানহা দারী'

যত গুণ ও সৌন্দর্য সকলে ধারণ করেছেন, আপনি একাই তা ধারণ করেছেন।

এটা ঠিক। তবে সর্বগুণের মাঝে সেরা গুণ এবং সর্ব সৌন্দর্যের মাঝে সেরা সৌন্দর্য বলে একটি কথা আছে। সেদিক থেকে যদি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোটা যিন্দেগি এবং সীরাতে তাইয়েবা পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাই যে, তাঁর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বলতার মাঝেও দু'আ ও মুনাজাতের গুণবৈশিষ্ট্যটি ছিলো সবচে' উজ্জ্বল। এ যেন 'বহু চাঁদের মাঝে এক পূর্ণিমার চাঁদ'! সারা জীবন আল্লাহর কাছে তিনি এত দু'আ-মুনাজাত করেছেন এবং এমনভাবে করেছেন যা দুনিয়াতে কখনো কেউ করেনি। কত অসংখ্য দু'আ, কত বৈচিত্র্যপূর্ণ মুনাজাত! কী হৃদয়ের উত্তাপ ও বিনয়কাতরতা! কী আবদিয়াত, মাসকানাত ও মুখাপেক্ষিতা! কী কান্না! কী অশ্রুধারা! কী আজেযি ও ইনকিসারি!

দু'আ ও মুনাজাত তিনি শুধু নিজেই করেননি, উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, এভাবে দু'আ-মুনাজাত করো, এভাবে হাত তোলো, এভাবে বিনয় ও কাতরতা প্রকাশ করো, এভাবে ভিক্ষুক ও কাঙ্গাল সেজে আঁচল পাতো এবং মাওলার কাছে চাও।

জীবনের অন্যসব বিষয়ের মত দু'আ ও মুনাজাতের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন উম্মতের শিক্ষক; এক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন, 'বুয়িছতু মুআল্লিমান'।

হাদীছের কিতাবে শত শত দু'আ বর্ণিত আছে। সেগুলো পূর্ণ ভক্তি-মহব্বত ও গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ুন, প্রতিটি দু'আ আবদিয়াত ও বন্দেগী, আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের প্রাণরসে পরিপূর্ণ, বরং যেন তা উপচে পড়ছে। এমনকি আপনি যে আদনা এক উম্মতি, প্রতিটি দু'আয় আপনারও হৃদয় একেবারে বিগলিত হয়ে যাবে; আবদিয়াত ও বন্দেগীর সজীবতায় আপনারও প্রাণ সজীব হয়ে ওঠবে।

তো আমার ভাই ও বন্ধু! হাদীছের ভাণ্ডারে সঞ্চিত এই সব দু'আ-মুনাজাত হচ্ছে নবুয়তের অতি বিশেষ এবং অতীব মূল্যবান মীরাছ বা উত্তরাধিকার সম্পদ।

আপনাদের প্রতি আমার আখেরী নছীহত ও শেষ উপদেশ এই যে, আপনাদের হতে হবে এই দু'আ-মুনাজাতেরও কাবিল ওয়ারিছ ও যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই দু'আ-মুনাজাতগুলোর সঙ্গে গভীর মহব্বত ও নিবিড় ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলুন। দিল দিয়ে, মন দিয়ে, জান দিয়ে, প্রাণ দিয়ে আপনিও আপনার মাওলার দরবারে এই দু'আ-মুনাজাত করুন এবং অতি সামান্য পরিমাণে হলেও আপনার পেয়ারা নবী যেভাবে করেছেন সেভাবে করার চেষ্টা করুন।

দু'আ তখনই দু'আ হয় এবং মুনাজাত তখনই হয় মুনাজাত যখন দিলে থাকে চাহাত ও তড়প এবং চাহিদা ও তলব। ক্ষুধার্ত কীভাবে খাবার চায়! পিপাসার্ত কীভাবে পানি চায়! সেভাবে যদি চাইতে পারেন তাহলেই সেটা হবে দু'আ-মুনাজাত!

চাইবেন কাতর হয়ে, কাঙ্গাল ও ভিখারী হয়ে এবং এই একীন ও বিশ্বাস নিয়ে যে, আমি যা চাই তা শুধু তাঁর গায়েবের খাযানায় আছে এবং শুধু তাঁর কুদরতের কবযায় আছে। চাইলে তিনি খুশী হন, যত বেশী চাওয়া হয় তত বেশী খুশী হন–

ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے   جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے

তুমি তো হে মাওলা আমার, দিতে সদা তৈয়ার
চায় না যে তার প্রতি তাই তুমি বে-যার।

চাইবেন এই ইয়াকীন ও বিশ্বাস নিয়ে যে, আমার দু'আ-মুনাজাত, আমার চাওয়া ও ফরিয়াদ অবশ্যই তিনি কবুল করবেন; অবশ্যই তিনি আমাকে দান করবেন। কবে, কীভাবে তা আমি জানি না, আমি শুধু জানি, তিনি কবুল করবেন, অবশ্যই তিনি দান করবেন।

দু'আ যদি দিলের ভিতর থেকে না হয়, মুনাজাত যদি হৃদয়ের গভীর থেকে না হয়, দু'আ যদি হয় শুধু মুখের উচ্চারণ, মুনাজাত যদি হয় শুধু ঠোঁট-জিহ্বার সঞ্চালন তাহলে তা কিসের দু'আ! কিসের মুনাজাত! শুধু হাত তোলা এবং কিছু বলা দু'আ-মুনাজাত নয়। দু'আ হলো হৃদয়ের আকুতি এবং অন্তরের কাতরতা। মুনাজাত হলো দিলের তড়প এবং কলবের বে-কারারি। জিহ্বা ও মুখের ভাষায় শুধু ভিতরের সেই ভাবের প্রকাশ ঘটে। দু'হাত উপরে ওঠা, মুখে কিছু শব্দ উচ্চারিত হওয়া, এটা হলো দু'আর দৃশ্যমান রূপ এবং মুনাজাতের বাহ্যিক ছুরত। দু'আ-মুনাজাতের হাকীকত ও মূল প্রাণ হলো ভিতরের সেই তড়প ও বে-কারারি, সেই আকুতি ও মিনতি।

মানুষ যখন ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হয় তখন সে কাঁদে, তার মুখ থেকে কান্নার শব্দ বের হয় এবং চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কান্নার এই শব্দ এবং চোখের এই অশ্রু আসল ব্যথা-বেদনা নয়, ব্যথা-বেদনার বাহ্যিক ও দৃশ্যমান

রূপমাত্র। আসল ব্যথা-বেদনা তার ভিতরে, অন্তরের গভীরে। কান্নায়, অশ্রুতে তার বাহ্যিক প্রকাশমাত্র।

ভাই ও বন্ধুগণ! উপরের আলোচনার আলোকে এবার আল্লাহর ওয়াস্তে একবার ভেবে দেখুন, আমাদের অবস্থা কী? কেমন আমাদের দু'আ-মুনাজাত! আহকামুল হাকিমীন, সকল দয়ালুর বড় দয়ালু, সকল দাতার বড় দাতা, বরং একমাত্র দাতা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমরা যখন দু'আ-মুনাজাত করি তখন কোথায় থাকে আমাদের হাত, আর কোথায় থাকে দিল! মুখে আমরা কী বলি, আর মনে কী ভাবি! গাফলাতের চাওয়া থেকে কী পাওয়া যায়, তিরস্কার ছাড়া! প্রাণহীন প্রার্থনা থেকে কী আশা করা যায়, বঞ্চনা ছাড়া! তবু মাওলা আমাদের মেহেরবান বলে এখনো, এমন দু'আ-মুনাজাতেও কিছু না কিছু আমরা পেয়ে যাই। হে আল্লাহ্, তবু আমরা তোমার শোকর আদায় করি না! তবু আমরা আসল চাওয়া চাইতে শিখি না!

একে তো আমরা দু'আ করি কম, খুব বেশী হলে ফরয নামাযের পর। দীর্ঘ মুনাজাতও হয় কখনো কখনো। কিন্তু আফসোস! শত শত আফসোস! আমাদের দু'আ-মুনাজাত হয় শুধু হাতের এবং ঠোঁট-জিহ্বার। তাতে থাকে না দিলের তড়প ও বে-কারারি এবং হৃদয়ের তাপ ও উত্তাপ; তাতে থাকে না অন্তরের কাকুতি-মিনতি এবং প্রাণের উচ্ছ্বাস ও তরঙ্গ; থাকে না আবেগের দোলা ও ভাবের দুলুনি। কিছুই থাকে না, তাই কিছুই পাওয়া যায় না।

ভাই, আফসোসের কথা এই যে, এ অবস্থা শুধু তোমাদের নয়, আমারও। সত্তরটা বছর পার হয়ে গেলো, এখনো শেখা হলো না, মাওলার দরবারে কীভাবে চাইতে হয়, কীভাবে মুনাজাত করতে হয়, এমনকি এখনো ভালোভাবে জানা হলো না, কেমন ছিলো আল্লাহর দরবারে আমার পেয়ারা হাবীবের দু'আ ও মুনাজাত! কান্না ও ফরিয়াদ! জীবনের সন্ধ্যা ও শামে যিন্দেগি ঘনিয়ে এলো, এখনো দাঁড়ানো হলো না কাঙ্গালবেশে, এখনো আঁচল পাতা হলো না ভিখারী সেজে! সূর্য ডোবার আগে হে আল্লাহ! দূর করে দাও আমার যিন্দেগির সব অন্ধকার! ধুয়ে মুছে ছাফ সরে দাও আমার জীবনের সব কলঙ্ক-কালিমা! জীবনসন্ধ্যার এই আলো-আঁধারে অন্তত একবার যেন চাইতে পারি তোমার দুয়ারে হাত তুলে, যেমন চেয়েছেন তোমার প্রিয় নবী! মউতের পর্দা নেমে আসার আগে হে আল্লাহ! এই বুড়ো বান্দাকে দান করো তোমার পেয়ারা হাবীবের একটি দু'আ, একটি মুনাজাত!

আমার ভাই ও বন্ধু! তোমাদের এখনো সময় আছে; এখন থেকে বেশী বেশী দু'আ করো, মুনাজাত করো, চাওয়ার অভ্যাস করো কাঙ্গালের মত, ভিখারীর মত। তোমাদের দু'আ যেন হয় রূহানিয়াত ও নূরানিয়াতে ভরপুর। তোমাদের মুনাজাত

যেন হয় দিলের তড়প ও বে-কারারি দ্বারা জানদার। তোমাদের প্রার্থনা যেন হয় আবেগের দোলায় এবং ভাবের তরঙ্গে সজীব ও প্রাণবন্ত। আল্লাহর দরবারে যখন হাত তোলো তখন এমনভাবে বিনয়-কাতরতা ও কাকুতি-মিনতি নিবেদন করো যেন আরশ দুলে ওঠে, যেন রহমতের দরিয়ায় জোশ ও জোয়ার এসে পড়ে।

যখন কেউ থাকে না, যখন কেউ দেখে না তখন সেই নির্জনে, অতি সঙ্গোপনে কেঁদে কেঁদে, অন্তত কান্নার ভান করে আল্লাহর কাছে চাও–

'হে আল্লাহ! আমাকে তুমি দান করো ঈমানের হাকীকত, নামাযের হাকীকত এবং তাকওয়া ও তাওয়াক্কুলের হাকীকত।

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তাওফীক দান করো ইলমে দ্বীন হাসিল করার, তোমার মারিফাত হাসিল করার। আমি যেন তোমার দ্বীনের খেদমত করার, তোমার হাবীবের উম্মতের রাহনুমায়ী করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি। আমি যেন তোমার পেয়ারা হাবীবের হাকীকী ওয়ারিছ ও নায়িব হতে পারি।' এভাবে হৃদয়-প্রাণ ঢেলে দু'আ করো, মুনাজাত করো, তারপর দেখো, আল্লাহ কত দান করেন! কেমন দয়া ও অনুগ্রহ করেন!

বিশেষ করে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল দু'আ-মুনাজাত করেছেন, তাঁর পাক যবানের পাক আলফায হুবহু সংরক্ষিত হয়েছে। হাদীছের প্রতিটি কিতাবে রয়েছে 'দু'আ অধ্যায়'। কখন, কোন পরিস্থিতিতে আল্লাহর পেয়ারা নবী কী দু'আ করেছেন তা সবই কাগজের পাতায় সংরক্ষিত রয়েছে, আপনি সেগুলো হৃদয়ের পাতায় সংরক্ষণ করুন। নববী দু'আর এই খাযানা হলো অতি মূল্যবান এক সম্পদভাণ্ডার, যার চাবি রয়েছে আমাদেরই কাছে, যারা মাদরাসায় হাদীছের কিতাব পড়ি এবং পড়াই। আল্লাহর ওয়াস্তে এই মহামূল্যবান মীরাছের উত্তরাধিকার গ্রহণ করুন এবং তা থেকে নিজেরা উপকৃত হোন, উম্মতে মুহাম্মাদিয়াকেও উপকৃত করুন।

আফসোস! নববী দু'আ-মুনাজাতের এই রত্নভাণ্ডারের কোন কদর আজ আমাদের মধ্যে নেই। যদি এমন কোন পরিমাপ-যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হতো যা দ্বারা আখেরাতের হিসাবে বিভিন্ন জিনিসের মান ও মূল্য নির্ধারণ করা যায়, তাহলে আমরা দেখতে পেতাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট ছোট দু'আ, যা মুখের উচ্চারণে খুবই হালকা, মীযানের পাল্লায় তা কত ভারী! দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদও তার তুলনায় কত তুচ্ছ!

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন, যেন আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ-মুনাজাতের এই মহা নিয়ামতের যথাযোগ্য কদর করতে পারি এবং উম্মতের প্রতি তাঁর এই ইহসান ও অবদানের পূর্ণ হক আদায় করতে পারি।

আমরা যেন আমাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার এই 'বান্দানেওয়াযি'র শায়ানে শান শোকর আদায় করতে পারি যে, তিনি আমাদেরকে দ্বীনী মাদরাসায় আরবীভাষা ও ইলমে দ্বীন হাসিল করার তাওফীক দান করেছেন, যার বরকতে আমাদের সামনে আজ নববী দু'আ ও মুনাজাতের অমূল্য রত্নভাণ্ডারের দুয়ার খুলে গেছে।

যদি সুযোগ থাকতো তাহলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একেকটি দু'আর হাকীকত ও তাৎপর্য আপনাদের সামনে তুলে ধরতাম, যাতে বুঝতে পারেন, কী অমূল্য সম্পদের অধিকারী আপনারা হয়েছেন এবং নিজেদের জীবনে সেগুলো ব্যবহার না করা কত বিরাট মাহরুমি ও বঞ্চনার বিষয়। একটি দু'আ দেখুন–

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ أَخْشَاكَ كَأَنِّىْ أَرَاكَ أَبَدًا حَتّٰى أَلْقَاكَ، وَأَسْعِدْنِيْ بِتَقْوَاكَ، وَلَا تُشْقِنِىْ بِمَعْصِيَتِكَ

হে আল্লাহ, আমাকে বানিয়ে দিন এমন, যেন আপনাকে (সর্বাপেক্ষা অধিক) ভয় করি, সর্বক্ষণ আপনাকে দেখার মত, যতক্ষণ না আপনার দীদার লাভ হয়। হে আল্লাহ, আমাকে খোশনছীব করুন আপনার তাকওয়া দ্বারা, আমি যেন বদনছীব না হই আপনার নাফরমানি দ্বারা।

এ ধরনের আরেকটি দু'আ–

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِىْ لِذِكْرِكَ وَارْزُقْنِىْ طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ

হে আল্লাহ, আমার দিলের কানগুলো খুলে দিন আপনার যিকির (শ্রবণ ও অনুধাবন)-এর জন্য। আর আমাকে দান করুন আপনার আনুগত্য এবং আপনার রাসূলের আনুগত্য এবং আপনার কিতাবের উপর আমল।

আরো একটি দু'আ–

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا وَأَسْأَلُكَ إِيْمَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ دِيْنًا قَيِّمًا وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الْغِنٰى عَنِ النَّاسِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

হে আল্লাহ, আপনার কাছে চাই স্থায়ী ঈমান এবং আপনার কাছে চাই অনুগত হৃদয় এবং আপনার কাছে চাই সত্য ঈমান এবং আপনার কাছে চাই সরল দ্বীন এবং আপনার কাছে চাই সকল রোগ-শোক থেকে নিরাপদতা এবং আপনার কাছে চাই স্থায়ী নিরাপদতা এবং আপনার কাছে চাই নিরাপদতার উপর শোকর করার যোগ্যতা এবং আপনার কাছে চাই মানুষের প্রতি নির্মুখাপেক্ষিতা। না আছে ক্ষমতা, না আছে শক্তি আল্লাহ (র সহায়তা) ছাড়া।

এই যে প্রায় অলৌকিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দু'আ, এগুলোর বিষয় ও ভাষ্য নিয়ে একটু চিন্তা করুন। অন্যরা না বুঝতে পারে, কারণ তরজমায় মূলের প্রাণরস কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কিন্তু আপনারা তো আরবীভাষার অলঙ্কার ও সৌন্দর্য জানেন। দেখুন তো প্রতিটি শব্দ কী আশ্চর্য কোমলতা ও কাতরতার সঙ্গে অন্তরকে স্পর্শ করে এবং হৃদয়কে বিগলিত করে। প্রথম দু'আয় পাঁচটি পর্ব, প্রতিটি পর্বের শব্দগুচ্ছ যেন একটি করে মুক্তোগুচ্ছ। পর্বের পর পর্বের উচ্চারণে হৃদয়-বীণার তারে কী অপূর্ব ঝঙ্কার সৃষ্টি হয়!

আর বিষয়বস্তু! বলুন তো যদি আল্লাহকে সর্বক্ষণ দেখতে পাওয়ার মত ভয় নসীব হয়ে যায় তাহলে জীবনটা কেমন পূতপবিত্র ও শুচিশুভ্র হতে পারে! তাকওয়ার শুধু প্রার্থনাই করা হলো না, তাকওয়া যে সকল সৌভাগ্যের আধার, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার স্বীকৃতি প্রদান করে মিনতি নিবেদন করা হলো, আমাকে আপনি এ মহাসৌভাগ্য দান করুন। একইভাবে নাফরমানি থেকে পানাহ শুধু চাওয়াই হলো না, বরং তা যে সর্বপ্রকার বদনছীবির মূল তাও সভয়ে স্বীকার করে নিয়ে কেমন কাতর প্রার্থনা করা হলো তা থেকে রক্ষা লাভের!

মহান দাতার চিরকরুণার স্বরূপ কল্পনা করে এবং নিজের আবদিয়াত ও দীনতার অনুভূতি অন্তরে জাগরূক রেখে, তারপর আরবীভাষার 'সৌন্দর্য-স্বাদ' উপভোগ করে এই দু'আটি একবার নিবেদন করুন আল্লাহর দরবারে এবং নিজের ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন তো কেমন আত্মিক শান্তি ও প্রশান্তি এসেছে সেখানে!

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ أَخْشَاكَ كَأَنِّىْ أَرَاكَ أَبَدًا حَتّٰى أَلْقَاكَ، وَأَسْعِدْنِىْ بِتَقْوَاكَ، وَلَا تُشْقِنِىْ بِمَعْصِيَتِكَ

দ্বিতীয় দু'আয় দেখুন; হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়ার কথা আমরা বলি এবং তার সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হয়ে যাই। কিন্তু مَسَامِعُ الْقَلْبِ কি জিনিস, কীভাবে আপনি তা বোঝাবেন আপনার ভাষাভাষী মানুষকে! যে যিকির আমি কানে শুনি, তা যেন আমার কান পর্যন্তই না থাকে, হৃদয় যেন সেই যিকিরের আবেদন গ্রহণ করতে

পারে। হৃদয়ের আবেদন গ্রহণ করার যোগ্যতা পরিস্ফুটিত করে দিন। এই সব কথা আছে, 'ইফতাহ মাসামিআ কালবী' এই তিনটিমাত্র শব্দে!

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই হলো মুমিনের আত্মার খোরাক, এই অনুভূতি আমরা লাভ করি 'উরযুকনি' শব্দটি থেকে, যার তরজমা আমাদের করতে হচ্ছে শুধু 'দান করুন' বলে।

ভাষাসৌন্দর্যও লক্ষ্য করুন, তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে দু'আটিকে। তিনটি কাফুল খিতাবকে সাকিন করে পড়ুন, আর দেখুন কেমন একটি সুরমূর্ছনা আপনার অন্তরকে মুগ্ধ অভিভূত করে রাখে!

তৃতীয় দু'আটির ভাষা-সৌন্দর্য ও মর্মগভীরতা শুধু কিছুটা অনুভব করা যেতে পারে, ভাষায় প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। 'আসআলুকা'-এর বারংবার উচ্চারণে আল্লাহর কাছে বান্দার কাঙ্গালপনার যে পরম প্রকাশ ঘটেছে, বাংলা তরজমায় কোথায় তার কিঞ্চিৎ ছায়া, কিংবা সামান্য ছোঁয়া! যত বার বলছি 'আসআলুকা' তত বার যেন ভিতরে গিয়ে তা এই প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে, 'তোমার দুয়ারে হে দাতা, আমি কাঙ্গাল'!

যদি বলা হতো–

إِيْمَانًا دَائِمًا صَادِقًا

তাহলে! পুনরুক্তি দ্বারা ঈমানের প্রতি যে আকুতি প্রকাশ পায় তা হারিয়ে যেতো। ঈমানের বাসস্থান যে কলব, তার অনুভূতি আসে 'দুই ঈমানের মাঝে' কালবান খাশিআন'-এর অবস্থান থেকে। পরপর দু'টি গুণ, প্রথমটি হলো ঈমানের ব্যাপ্তি, দ্বিতীয়টি ঈমানের গভীরতা। তার মাঝখানে কলবের এই সিফাতটি দ্বারা নিবেদন করা হয়েছে, আমাকে এমন কলব দান করুন যা ঈমানকে ধারণ করতে পারে। خَاشِعٌ শব্দটির কোন প্রতিশব্দ কি আছে পৃথিবীর কোন ভাষায়! যে কলবে ভয়-ভীতি আছে, বিনয় ও কাতরতা আছে, নিবেদন ও সমর্পণ আছে, একাগ্রতা ও নিমগ্নতা আছে সেটাই হলো কালবে খাশি'।

(অনুবাদকের কথা– উর্দূ ভাষাকে আমার ঈর্ষা হয় যে-সব কারণে তার একটি এই যে, আরবী শব্দকে সে এমনভাবে নিজের আঁচলে তুলে নেয় যেমন আমরা কোঁচড়ে তুলে নেই বাগানে গাছের নিচে বিছিয়ে থাকা শিউলি ফুল! দেখুন না উর্দূতে কালবান খাশি'আন এর তরজমা করা হচ্ছে 'কালবে খাশি'' বলে এবং উর্দূভাষীরা তা বুঝেও নিচ্ছে স্বচ্ছন্দে! হে বাংলাদেশের আলিম-সমাজ, কবে তোমরা পারবে তা?)

মানবজীবনের সবচে' কাঙ্ক্ষিত বিষয় ধনসম্পদ নয়, যশ-খ্যাতি নয়, অন্য কোন কিছুই নয়, অপ্রিয় সবকিছু থেকে নিরাপদ থাকাই হলো সবচে' কাঙ্ক্ষিত

বিষয়। বারবার আল-আফিয়াহ-এর তাকরার সেদিকেই নির্দেশ করে, আর এজন্যই আলাদাভাবে আল-আফিয়াহ-এর উপর শোকর আদায়ের তাওফীক চাওয়া!

তারপরই পানাহ চাওয়া হয়েছে জীবনের সবচে' কষ্টকর বিষয়টি থেকে, আর তা হলো কোন কিছুতে কারো মুখাপেক্ষী এবং কারো উপর নির্ভরশীল হওয়া। একে একে এত কিছু চাওয়ার পর আত্মনিবেদনের চূড়ান্ত প্রকাশ করা হলো 'লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে। চাইতে চাইতে, মাগঁতে মাগঁতে ভিখারী যেন হঠাৎ দাতার কুদরতি কদমে এসে লুটিয়ে পড়লো! উপরের অনুভূতিগুলো অন্তরে ধারণ করে আবার নিবেদন করুন না দু'আটি পরম দয়ালু আল্লাহর দরবারে!

হাদীছভাণ্ডারে সংরক্ষিত প্রতিটি দু'আ এভাবে হৃদয়ঙ্গম করে পড়ুন এবং মাওলার দরবারে নিবেদন করুন, তারপর দেখুন কী মহা ঐশ্বর্য আপনার হৃদয় অর্জন করে! কী সুকূন ও সাকীনাহ্ আপনার কলব হাসিল করে!

দু'আই বান্দার একমাত্র অবলম্বন

আমার ভাই ও বন্ধুগণ! তো আমার আখেরী নসীহত এটাই যে, আল্লাহর দরবারে বিনয়-কাতর প্রার্থনা ও দু'আ-মুনাজাত, যা প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ থেকে বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য সেটাকে আপনারা নিজেদের জীবনে আঁকড়ে ধরুন। নিয়মিত দু'আ ও মুনাজাত করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আল্লাহ তাআলার দান ও দয়ার প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে পূর্ণ বিনয়-কাতরতার সঙ্গে প্রার্থনা করুন। নিজের সকল প্রয়োজন তাঁরই কাছে নিবেদন করুন, হোক তা দুনিয়ার প্রয়োজন বা আখেরাতের প্রয়োজন। জান্নাত প্রার্থনা করুন, জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা প্রার্থনা করুন, ঈমান ও বিশ্বাস প্রার্থনা করুন, যাবতীয় আমল ও ইবাদতের তাওফীক প্রার্থনা করুন। ইলমে নববীর মীরাছ প্রার্থনা করুন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি প্রেম ও আনুগত্য প্রার্থনা করুন। মোটকথা, জীবনে যা কিছু আপনার কাম্য ও কাঙ্ক্ষিত তা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন এবং যা কিছু অপ্রিয় ও অনাকাঙ্ক্ষিত তা থেকে আল্লাহর সুরক্ষা প্রার্থনা করুন। আর দু'আ ও মুনাজাতের ক্ষেত্রে বেশীর চেয়ে বেশী নবুয়তের পাক যবানের পাক আলফায অনুসরণ করুন, যাতে কবুলিয়াতের বেশী আশা করা যায়।

আল্লাহই সর্বদাতা এবং একমাত্র দাতা। বড় থেকে বড় কোন পূর্ণতা ও যোগ্যতার উপর এখনো এমন কোন মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়নি যে, আর কেউ তা পাবে না। এমন কোন ফায়সালা করা হয়নি যে, আমাদের পূর্ববর্তীদের যা

কিছু দান করা হয়েছে তা আর কাউকে দান করা হবে না। ইলমের যে স্তরে তাঁরা ছিলেন, রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার যে মাকামে তাঁরা ছিলেন তা তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে। না, তা নয়। আল্লাহর দান তখনকার জন্য যেমন ছিলো, এখনকার জন্য তেমনি আছে। তখনো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়েছে, এখনো হয়; তখনো গাছে ফুল ফুটেছে, এখনো ফোটে; তখনো চাঁদের জোসনা ছিলো, এখনো আছে; তখনো ভোরে সবুজ ঘাসের উপর শিশির ঝরেছে এখনো ঝরে। ইলমের সাধনা তখন যেমন ছিলো এখনো যদি তেমন থাকে তাহলে কেন আমার কলবের গুলবাগে ফোটবে না ইলমের গোলাব!

ইমাম গাযযালী, ইমাম রাযী (রহ.) এবং অন্যান্য ওলামায়ে কিরাম আমাদের মাথার তাজ। তাঁদের ইলমের যাকাত গ্রহণ করেই আমরা আজ এত ধনী। তাঁদের জ্ঞানের আলো দ্বারাই আমাদের জ্ঞানের জগত আজ আলোকিত। এ সবই সত্য। আমরা অবশ্যই তাঁদের ঋণ স্বীকার করি। কিন্তু আল্লাহর দান! তা তো কোন যুগের সীমানায় আবদ্ধ নয়! সে যুগের রাযী, গাযালী না হোক, অন্তত এখনো পয়দা হতে পারে যামানার রাযী, গাযালী, যামানার কুরতুবী, তাহাবী এবং যামানার দেহলবী, কাশ্মীরী!

তদ্রূপ হযরত জোনায়দ বাগদাদী, শায়খ আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) ও অন্যান্য আউলিয়ায়ে কেরাম। তাঁরা আমাদের মহান পূর্ববর্তী। তাঁরা আমাদের সারতাজ। তাঁদের পদধূলি গ্রহণ করেই আমরা আজ ধন্য, তাঁদের রূহানিয়াত ও নূরানিয়াত থেকেই আমাদের কলবের জাহান আবাদ ও আলোকিত। এ সবই সত্য। তাঁদের ইহসান ও অবদান অবশ্যই আমরা স্বীকার করি, স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু আল্লাহর দান! স্থান ও কালের কোন গণ্ডি তো আল্লাহর দানকে আটকে রাখতে পারে না! সে যুগের জোনায়দ, জিলানী না হোক, অন্তত যামানার জোনায়দ, জিলানী তো পয়দা হতে পারে এখনো।

সুন্নাতুল্লাহ এই যে, যে কোন স্থানের এবং যে কোন যুগের মানুষ ইলমী ও রূহানী তরক্কীর জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের সঙ্গে মেহনত মুজাহাদা করবে, কামাল ও কামালিয়াত হাসিলের শর্তগুলো পূর্ণ করবে এবং হক আদায় করে আল্লাহর কাছে সওয়াল করবে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে ইলমী ও রূহানী মাকাম দান করবেন। আল্লাহর দানে কোন কুণ্ঠা নেই, বান্দার গ্রহণে যদি কার্পণ্য না থাকে। হাদীছ শরীফে তো এমন মাযমূনও এসেছে যে, এই উম্মত হলো বৃষ্টির মত। কেউ বলতে পারে না যে, তার শুরুতে বেশী কল্যাণ, না শেষে! অর্থাৎ সাধারণ অবস্থা তো এটাই যে, বিগত যুগ নবুয়তের দিকে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে অধিকতর কল্যাণপূর্ণ, তবে খাছ খাছভাবে পরবর্তী যুগের কল্যাণ পরবর্তী যুগের সমান, এমনকি বেশীও হতে

পারে। দাতা যখন দান করেন বাধা দেয়ার কেউ নেই, আবার দাতা যদি না দেন তাহলে পাওয়ার কোন উপায় নেই। তবে সে যুগে যেমন প্রত্যেক রাত্রের শেষভাগে আসমান থেকে নেদা দেয়া হতো, আছে কি কোন মাগফেরাত তলবকারী, যাকে আমি মাফ করবো? তারা যারা মুছল্লায় দাঁড়িয়েছেন এবং কাঙ্গাল ও ভিখারী সেজে প্রার্থনা করেছেন তারা মাগফেরাত পেয়েছেন এবং আঁচল ভরে দান পেয়েছেন। এ যুগেও প্রতি রাত্রের শেষভাগে একইভাবে আসমানের ঘোষণা জারি আছে। এখনো যারা শেষ রাতে মুছল্লায় দাঁড়াবে, দু'হাত তুলে কাকুতি-মিনতি করে ফরিয়াদ জানাবে, তারা আল্লাহর পক্ষ হতে মাগফিরাত লাভ করবে, তাদের উপর একইভাবে এবং আরো প্রবলভাবে, মুষলধারে আল্লাহর দান বর্ষিত হবে।

সুতরাং হে আমার প্রিয় ভাই, কেন তোমরা নিরাশ হবে? এ যুগেও তোমরা সবকিছুই হতে পারো। আল্লাহর কাছ থেকে তোমরা ঐ সবকিছুই অর্জন করতে পারো, যা আমাদের আসলাফ ও পূর্ববর্তীগণ অর্জন করেছেন। শর্ত একটাই। তাঁরা যে পথের পথিক ছিলেন, আমাদেরও হতে হবে সেই পথের পথিক। পথ চলার জন্য তারা যে পাথেয় গ্রহণ করেছিলেন, আমাদেরও গ্রহণ করতে হবে একই পাথেয়। পথ ও পাথেয় যদি অভিন্ন হয়, ইনশাআল্লাহ মানযিলও হবে অভিন্ন। তবে তুর্কিস্থানের পথ ধরে সে যুগে যেমন কাবায় পৌঁছা সম্ভব হয়নি, এ যুগেও তা সম্ভব হবে না, হতে পারে না।

খোলাছা কথা

আমার পেয়ারে ভাই! দিলের দরদ-ব্যথার কারণে এবং ভাব ও আবেগের প্রবাহের কারণে কথা অনেক লম্বা হয়েছে, তবে এই লম্বা বয়ানের খোলাছা খুবই মুখতাছার। আর তা এই যে–

প্রথমত আপনারা নিজেদের চিনুন। নিজেদের মাকাম ও মরতবা এবং অবস্থান ও মর্যাদা বুঝতে চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয়ত ইলমের তলবে নিজেদের ফানা করে দিন। সত্যিকার মজনুরূপে 'লায়লা ইলম'কে হাসিল করার চেষ্টা করুন।

তৃতীয়ত তাআল্লুক মাআল্লাহ পয়দা করুন, তাকওয়া ও আল্লাহভীতির মাকাম হাসিল করুন, আর তা হবে জানদার ইবাদতের মাধ্যমে, রূহানিয়াত ও নূরানিয়াতপূর্ণ নামায ও তিলাওয়াতের মাধ্যমে।

চতুর্থত গোনাহের খাবাছাত ও গান্দেগি থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন এবং তাওবা ও ইসতিগফারের মাধ্যমে নিজেকে পাক-ছাফ রাখার চেষ্টা করুন।

পঞ্চমত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ-মুনাজাতের সাথে সম্পর্ক পয়দা করুন। তিনি যেভাবে আল্লাহর দরবারে দু'আ-মুনাজাত করেছেন তার সামান্য পরিমাণ হলেও নিজেদের মধ্যে আনার চেষ্টা করুন। পরম দাতা ও পরম দয়ালু আল্লাহ তাআলার দান ও দয়ার উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে কাঙ্গাল হয়ে, ভিখারী সেজে আল্লাহর কাছে চাইতে থাকুন। তারপর দেখুন আল্লাহ তাআলা আপনাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন! আল্লাহর তো ওয়াদা এই যে, বান্দা যদি আল্লাহর দিকে এক বিঘত আগে বাড়ে, আল্লাহ বান্দার দিকে একহাত আগে বাড়েন, আর বান্দা যদি আল্লাহর দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি দৌড়ে অগ্রসর হোন। আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য।

আমার পেয়ারে ভাই! এ পর্যন্ত আপনাদের সামনে আমি যা কিছু বলেছি, যে সকল নসীহত আপনাদের খেদমতে আরয করেছি তা প্রথমত আমার নিজের জন্য, তারপর আপনাদের জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে এই কথাগুলোর উপর পূর্ণ আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন। কিয়ামতের দিন এ কারণে যেন আমার পাকড়াও না হয় যে, মানুষকে তো ভালো ভালো নসীহত করেছো এবং সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিয়েছো, কিন্তু নিজে তার উপর আমল করোনি। তদ্রূপ আপনারা যেন এ কারণে ধৃত না হন যে, তোমাদের কাছে তো কল্যাণের বাণী পৌঁছানো হয়েছিলো, তোমরা তা গ্রহণ করোনি কেন? কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন–

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ، اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ، وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ

সুতরাং আপনি আমার বান্দাদের খোশখবর দিন, যারা মনোযোগের সঙ্গে কথা শোনে, তারপর তার উত্তম অংশকে অনুসরণ করে। ওরাই হলো এমন লোক যাদের আল্লাহ তাআলা হিদায়াত দান করেছেন। আর ওরাই হলো জ্ঞানের অধিকারী। (সূরা যুমার ১৭–১৮)

আমার পেয়ারে ভাই! বিদায়! হয়ত আবার দেখা হবে, হয়ত কখনো আর দেখা হবে না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জান্নাতে একত্র করেন, আমীন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহ.)

অনুবাদ : মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

বাইতুল্লাহর ছায়া থেকে

– মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ

[মৌখিক ও লিখিত নসীহতের ধারা অত্যন্ত প্রাচীন। বড় ছোটকে, পিতা সন্তানকে, উস্তাদ শাগরিদকে এবং শায়খ তার মুরিদকে নসীহতের মাধ্যমে রাহনুমায়ী করে থাকেন। কুরআন হাকীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বান্দাদের হেদায়াতের জন্য তাঁর খাছ বান্দাদের অনেক অছিয়ত ও নসীহত উল্লেখ করেছেন। হাদীস শরীফেও এর নমুনা বিদ্যমান রয়েছে। সালাফে সালেহীন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এই ধারা চলমান রয়েছে। তারিখ ও আদাবুল ইলম বিষয়ক গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান লিখিত নসীহতের সংখ্যা কম নয়। এই বছর আমার সৌভাগ্য হয়েছে, তালীম ও তারবিয়তের অঙ্গনে অত্যন্ত খামুশীর সঙ্গে মুজাদ্দিদানা খিদমত আঞ্জামদানকারী ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দাম্মাত বারাকাতুহুম-এর একটি পত্র বহন করার। বাইতুল্লাহ থেকে একটি মূল্যবান নসীহতনামা তিনি আমার হাতে মাদরাসাতুল মদীনার তালিবে ইলমদের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং ছাত্রদের সামনে পড়ে শোনানোর দায়িত্বও আমার উপর অর্পণ করেছিলেন।

ইতিপূর্বে এই ধরনের অনেক চিঠি আমি পড়েছি। কিন্তু এটির মতো গভীর, সমৃদ্ধ ও দূরদর্শী নসীহতনামা খুব কম পড়েছি। যদিও তা মাদরাসাতুল মদীনার তালিবে ইলমদের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়েছে কিন্তু সকল আলেম ও তালিবে ইলমের জন্যই তা হতে পারে আলোকবর্তিকা। 'ছাহেবে রিসালা'র অনুমতিক্রমে তা আলকাউসারে শিক্ষার্থীদের পাতায় পেশ করা হল।] – মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাদরাসাতুল মদীনাহর প্রিয় তালিবানে ইলম!

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

আল্লাহর ঘরের সামনে বসে তোমাদের জন্য কয়েকটি কথা লিখছি। আল্লাহ যেন মেহেরবানী করে এই কথাগুলোকে আমার জন্য এবং তোমাদের সকলের জন্য নূর বানিয়ে দেন, আমীন। তোমাদেরকে আমি মুহাব্বত করি আল্লাহর ওয়াস্তে এবং তোমাদের যিন্দেগীর কামিয়াবি আমার আন্তরিক কামনা। পিছনের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের মাদরাসাতুল মদীনার সকল তালিবে ইলমকে আল্লাহ কবুল করুন, আমীন। বাইতুল্লাহর যিয়ারত এবং রওযা শরীফে হাজিরী নসীব করুন। কবুলিয়াত ও মাকবুলিয়াত দান করুন, আমীন।

জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ববিষয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোন আশ্রয়স্থান নেই। আল্লাহর চেয়ে আপনও আমাদের কেউ নেই। আনন্দ কিংবা বেদনা, সুখ কিংবা দুঃখ, সচ্ছলতা কিংবা অনটন যা কিছু আল্লাহ দেন আমাদের কল্যাণের জন্যই দেন যদি আমরা তা শোকর ও সবরের সাথে গ্রহণ করতে পারি। তিনিই শুধু দান করতে পারেন সুখ, শান্তি এবং তিনিই শুধু দূর করতে পারেন দুঃখ ও অশান্তি। আল্লাহ যেন আমাদের ভালোবাসেন এবং আমরা যেন আল্লাহকে ভালোবাসতে পারি। মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসাও যেন শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আমাদের যিন্দেগীর জন্য উসওয়া এবং আদর্শ। আমাদের আখলাক ও চরিত্র এবং আমাদের চিন্তা ও কর্ম সবকিছু যেন হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক ও চরিত্র এবং চিন্তা ও কর্মের প্রতিবিম্ব। এজন্য মাদরাসাতুল মদীনাহর প্রতিটি ছাত্রের অপরিহার্য কর্তব্য হল সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুতালাআ, যাতে আমরা তাঁর নূরানী যিন্দেগী অনুসরণ করতে পারি।

আমলের গোমরাহীর মতো চিন্তার গোমরাহীও ভয়াবহ; বরং চিন্তার গোমরাহী আরো বেশি ভয়াবহ। কারণ তা অনেক সময় ইরতিদাদ পর্যন্ত নিয়ে

যায়। চিন্তার গোমরাহীর থেকে বাঁচার জন্য অতি জরুরি হল, সালাফে সালিহ-এর অনুসরণ করা। নিকট যুগের তিনজন মহান ব্যক্তিকে মাদরাসাতুল মদীনাহর তালিবে ইলমের জন্য আমি অনুসরণীয় মনে করি। কারণ সম্মিলিতভাবে তাঁরা সালাফে সালিহীনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব করছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহ.), দাঈ ইলাল্লাহ হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) এবং মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)। এই তিন মহান ব্যক্তির মাধ্যমে তোমরা যদি সালাফে সালিহীনের এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে সুন্নতে নববীর অনুসরণ করতে পারো তাহলে এই ফিতনা-ফাসাদের যুগেও ইনশাআল্লাহ সমস্ত গোমরাহী থেকে– আমলের গোমরাহী, আখলাকের গোমরাহী এবং চিন্তা ও ফিকিরের গোমরাহী থেকে নিরাপদ থাকবে।

যিন্দেগীতে যদি কামিয়াবি চাও তাহলে মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা কর। মায়ের সাথে (এবং বাবার সাথে) এমন আচরণ কর যাতে তোমার কথা মনে হলে তাদের চোখে পানি এসে পড়ে। খুশির কারণে এবং সন্তুষ্টির কারণে। কখনও মা-বাবার মনে কষ্ট দিও না, যদি তাদের দিলে কষ্ট এসে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মাফ চেয়ে নাও এবং তাদের মনের কষ্ট দূর করার চেষ্টা কর। সব সময় তাদের জন্য এই দুআ করতে থাকা।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا

ক্রোধ, ঝগড়া-বিবাদ এবং হিংসা-হাসাদ এগুলো মানুষের ভিতরের ও বাহিরের সকল সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং ক্রোধকে দমন করার চেষ্টা কর। পরিচিত-অপরিচিত, ছোট-বড় সকলের সঙ্গেই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাক। কারো ভালো কিছু দেখে তার প্রতি হিংসা কর না, কারণ সেটা তাকে আল্লাহ দিয়েছেন। আর আল্লাহর দানের প্রতি হিংসা হবে বরবাদির কারণ। তুমি গিবতা কর অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চাও যেন তোমাকেও তিনি তা দান করেন।

কখনও অহংকার কর না, অহংকারী ব্যক্তি হল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। অহংকার মানে নিজেকে বড় মনে করে অন্যকে ছোট মনে করা, নিজের দোষ সম্পর্কে বেখবর থাকা এবং অন্যের দোষ চর্চা করা। আল্লাহ যে সকল গুণ দান করেছেন সেগুলোকে আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ মনে না করে নিজের যোগ্যতা দ্বারা অর্জিত মনে করা। অহংকারের বিপরীত গুণ হল বিনয়। অর্থাৎ নিজেকে ছোট মনে করা এবং অন্যকে বড় মনে করা, আর নিজের যাবতীয় গুণকে শুধু আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ মনে করা। আল্লাহ যেন মাদরাসাতুল মদীনাহর প্রতিটি

তালিবে ইলমকেই বিনয়ের গুণ দান করেন। বিনয় যেন হয় তাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য। যা কিছু ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও হীন সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখবে, আর যা কিছু বড়, মহৎ ও সুন্দর সেগুলো অর্জন করার চেষ্টা করবে।

বাইতুল্লাহর মুসাফির বাইতুল্লাহর সামনে বসে দিলের দরদের কালি দিয়ে এই কথাগুলো তোমাদের জন্য লিখে পাঠালো, আরো অনেক কথা লেখার ছিল তবে আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমার আদরের ছোট ছোট তালিবানে ইলম! ফুল বাগানে ফুলকলি যেমন তেমনি তোমরা হলে মানব বাগানের মানবকলি, মানব বাগানে একদিন তোমরা ফুল হয়ে ফোটবে এবং ইলমের, আমলের ও চিন্তা-চেতনার সুবাস ছড়াবে– এ আশাই করছি আল্লাহর কাছে। আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার সময় তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পরে তোমাদের মতো যারা আসবে তাদের জন্য আমি দুআ করছি। তোমরা শুধু আমার তিনটি নসীহতের উপর আমল করার চেষ্টা করো, মা-বাবাকে খুশি করো, তাদের মনে কখনও কষ্ট দিও না; কখনও মিথ্যা কথা বলো না এবং অভদ্র কোনো আচরণ করো না; সময় নষ্ট করো না এবং লেখাপড়ায় অবহেলা করো না। এই তিনটি উপদেশ যদি মেনে চলো তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমাদের জীবন হবে ফুলের মতো সুন্দর। আমি তোমাদের সবার জন্য দুআ করি এবং সবার কাছে দুআ চাই, আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে কবুল করেন। আমীন।

তোমাদের খাদেম
আবু তাহের মিসবাহ
১৫ যিলহজ্জ ১৪২৯ হিজরী

সৌজন্যে : মাসিক আলকাউসার
সংখ্যা : সফর ১৪৩০ হিজরী